প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে চণ্ডীমঙ্গল জিনিষটা কি, তাহা জানা আবশ্যক। চণ্ডী—হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীর একটি নাম। চণ্ড শব্দের অর্থ অত্যন্ত কোপন, উগ্রস্বভাব এবং তীক্ষ্ণ। অসুর-বধের সময়ে পার্ব্বতীর স্বভাব খুব উগ্র হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার একটি নাম চণ্ডী। লৌকিক ব্যবহারে চণ্ডী শব্দের আর একটি অর্থ মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য। দ্বিতীয় অর্থটি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য নহে। অতএব উহা ত্যাগ করিয়া, প্রথমোক্ত

চণ্ডীমঙ্গল শব্দের অর্থ

অর্থ অর্থাৎ চণ্ডী পার্ব্বতীর একটি নাম, এই অর্থ লইয়াই আমরা আলোচনায় অগ্রসর হইব। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে "চণ্ডীমঙ্গলে"র পরিবর্ত্তে যদিও অনেক স্থলে সারদামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অভয়ামঙ্গল প্রভৃতি নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা চণ্ডীর অন্যান্য নামভেদ মাত্র মনে করিয়া, এই শ্রেণীর সমস্ত গ্রন্থকেই আমরা এই প্রবন্ধে "চণ্ডীমঙ্গল" নামে অভিহিত করিব—অবশ্য সেই সেই গ্রন্থের প্রচলিত নাম পরিত্যাগ করিয়া নহে। মঙ্গল শব্দের অর্থ কল্যাণ—কুশল। সোজা ভাবে এই অর্থটি গ্রহণ করিলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তাই এখানে আমাদিগকে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ এই অর্থটিকেই একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইতে হইবে। যাহার উপাখ্যান, কথা, পালা, গান বা জীবনচরিত শুনিলে শ্রোতা এবং গায়কের মঙ্গল—কুশল হয় বা মঙ্গল হইবে বলিয়া যাহা গান করা বা শোনা হয়, তাহাই মঙ্গল। সুতরাং প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গল অর্থে আমরা হিমালয়-কন্যা পার্ব্বতী দেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক এক শ বছর পূর্ব্বেকার বা তদূর্দ্ধ কালের উপাখ্যান, কথা, পাঁচালী, পালা, গান বা তদ্বিষয়ক কাব্য বুঝিব।

চণ্ডীমঙ্গল প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিরাট্ অংশ এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চণ্ডী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর যেরূপ বর্ণনা আছে, চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী সেরূপ নহেন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে ইঁহাদিগকে আমরা পৌরাণিক এবং লৌকিক, এই দুই নামে অভিহিত করিব।

চণ্ডীমঙ্গলকেও এইরূপে দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে,—প্রথম পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিতীয় লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল। পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল—মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ, লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল ইহা হইতে স্বতন্ত্র। এই প্রবন্ধে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গলই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইবে।

পৌরাণিক চণ্ডী দেবগণের দুঃখ-দৈন্য দেখিয়া অনেক স্তব-স্তুতির পর অসুর-বধের জন্য আবির্ভূত। অসুর-বধের পর দেবগণকে সামান্য কিছু উপদেশ দিয়া এবং তাঁহার মাহাত্ম্য

উভয়ের চরিত্রে পার্থক্য

শুনিলে জীবগণের দুঃখ-দৈন্য দূর হইবে, এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। নিজের পূজা প্রচার করিবার জন্য তাঁহাকে

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

চিন্তিত বা মাথা ঘামাইতে হয় নাই। লোকে তাঁহাকে পূজা করুক, এ বিষয়ে তিনি ততটা আগ্রহও দেখান নাই। লৌকিক চণ্ডী ইহার বিপরীত। তাঁহাকে নিজের পূজা প্রচারের জন্ম অনেক চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে পূজা করিতে চায় না; তিনি যেন সাধ্য-সাধনা করিয়া ও ভয় দেখাইয়া পূজা করাইতে ব্যস্ত। পৌরাণিক চণ্ডী—দেবী; লৌকিক চণ্ডী কথায় কথায় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যেন মানব-চরিত্রের অভিনয় করিতেছেন। ইহাঁর বিবেচনা-শক্তিও কম;—পদ্মা সখী ইহাঁর পাছে পাছে না থাকিলে ইনি অনেক অকাজ-কুকাজ করিয়া ফেলিতেন। লৌকিক চণ্ডীর এইরূপ মানবীয় চরিত্র একমাত্র বিষহরীর সহিতই উপমিত হইতে পারে। বিষহরীর ন্যায় ইনিও সখীকে বলিতেছেন,—

অমলা বিমলা লীলা পদ্মাবতী গুণশীলা
পঞ্চ কন্যা যুক্তি মোরে দে।
স্বর্গে পূজে সুরপতি দেবতাএ করে স্তুতি
মর্ত্তে পূজিবে মোরে কে॥—মা, আ, চ।

উভয়ের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, যদিও পৌরাণিক চণ্ডী দেবতা এবং মানবের হিতসাধনের জন্যই আবির্ভূত, তথাপি তিনি যেন আমাদের বাংলার ঘরের চণ্ডী নহেন। লৌকিক চণ্ডী যেমন আমাদের সুখ-দুঃখ, আরাম-বিরাম, সকল অবস্থার সহিত বিজড়িত, পৌরাণিক চণ্ডী সেরূপ হইতে পারেন নাই। এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, লৌকিক চণ্ডী এমন একটি জিনিষের মিশ্রণে উৎপন্ন, যাহা বাংলা দেশের নিজস্ব বস্তু; তাই তিনি বাঙ্গালীর এত আপনার। পৌরাণিক চণ্ডী যদি অবিকৃত ভাবে আমাদের নিকট বিরাজমান থাকিতেন, তবে তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণ ছাড়িয়া আমাদের মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিতেন না এবং খুল্লনার সহিত তাঁহাকে বনে বনে ছাগল চরাইতে যাইতে হইত না। হিমালয়ের পাদমূলে গিয়া, স্তব-স্তুতি করিয়া দেবগণ পৌরাণিক চণ্ডীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে বিনা আবাহনে পচা মাংসের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ কালকেতুর কুটীরে গিয়া লৌকিক চণ্ডী উপস্থিত। এই যে চরিত্রের পার্থক্য, কবির রুচির স্বাধীন বিকাশ, রামায়ণ এবং মহাভারতের একঘেয়ে অনুবাদের পাশে ইহা আমাদিগকে বিশেষ আনন্দ দান করিলেও লৌকিক চণ্ডী যে অপর কোনও ধর্ম্মের মিশ্রণে উৎপন্ন, সে কথা আমাদিগকে মনে করাইয়া দেয়।

এইটি কোন্ ধর্ম্ম, তাহাই আমরা এখন অনুসন্ধান করিব। বাংলায় প্রচলিত শিবের গাজন বা ধর্ম্মপূজাকে মহাদেবের পূজা এবং উৎসব বলিয়াই আমরা জানিতাম। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহু দিন হইল, আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ধর্ম্মপূজা আর কিছুই নহে; উহা কেবল বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশেষ। কয়েকটি হিন্দু দেবতার নামে নিজের শরীর আচ্ছাদন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে। "ধর্ম্ম-

ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ

পূজাবিধান"[১] নামক একখানি বই আবিষ্কার করিয়া এই কথা তিনি অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী কোন্ ধর্ম্মের মধ্য হইতে আসিয়াছেন এবং কিরূপে পৌরাণিক চণ্ডীর আকার ধারণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছেন, উক্ত ধর্ম্মপূজাবিধান হইতেই আমরা তাহার অনেকটা আভাস পাই।

মহাকবি চণ্ডীদাস চণ্ডীর উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার উপাস্য চণ্ডীর নাম ছিল বাসুলী। ধর্ম্মপূজাবিধানে আমরা দেখিতে পাই, বাসুলী ধর্ম্মের একটি আবরণ-দেবতা। এই গ্রন্থে তাঁহার যে ধ্যান আছে, তন্মধ্যে তিনি চণ্ডীরূপে বর্ণিত এবং আবাহন-মন্ত্রে তাঁহার নাম 'চণ্ডিকা' ও 'মঙ্গলচণ্ডিকা'।[২] চণ্ডীদাসের একটি পদে জানা যায়, বাসুলীর আর এক নাম 'ডাকিনী'।[৩] এ দিকে চণ্ডীকাব্যে লহনার উক্তিতেও আমরা দেখিতে পাই যে, মঙ্গলচণ্ডী 'ডাকিনী' নামে অভিহিত হইতেছেন।[৪] বাসুলীর আবাহনে দেখিতে পাই, নদীতীরে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল (সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং), এ দিকে চণ্ডীকাব্যেও বর্ণিত আছে যে, মঙ্গলচণ্ডীর আদেশে কংস-নদীর তীরে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার জন্য মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।[৫] কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও 'বাসুলী' চণ্ডীর একটি নাম বলিয়া কথিত হইয়াছে।[৬] এই সকল প্রমাণে আমরা জানিতে পারিলাম যে, বাসুলী এবং মঙ্গলচণ্ডী কেবল দুইটি নামভেদ মাত্র, বস্তুতঃ উভয়ে একই দেবতা। এখন বাসুলীদেবী কোথা হইতে আসিলেন, তাহার সূত্র ধরিতে পারিলেই আমরা মঙ্গল-

মঙ্গলচণ্ডী ও বাসুলী এক দেবতা

---

১ এই পুথিখানি এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পত্তি। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

২ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ।—(ধ্যান)।
আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
অষ্টতণ্ডুলদুর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্মঙ্গলকারিণীং॥
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। (আবাহন-মন্ত্র)।—ধর্ম্মপূজাবিধান, ১০২-৩ পৃঃ।

৩ ডাকিনী বাশুলী, নিত্যা সহচরী, বসতি করয়ে তথা॥—পদসমুদ্র।

৪ তোমার মোহিনী বালা, শিক্ষা করে ডাইনি কলা, নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা॥—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সং, ১৯২ পৃঃ।

৫ কংস নদীর তটে, গঠহ সুন্দর মঠে, অনুবল দিলু হনুমান্॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী, ২১ পৃঃ।

৬ দুষ্টে উগ্রচণ্ডা, বাশুলী চামুণ্ডা, শ্রীফলশাখাবাসিনী॥—ক চ, বঃ সঃ, ৭৮ পৃঃ।

চণ্ডীর উৎপত্তির স্থল দেখিতে পাইব। "বাসুলী" এইরূপ একটি অসংস্কৃত নাম কখন হিন্দু দেবতার হইতে পারে না। তাই পরবর্ত্তী কালে বাসুলী যখন পৌরাণিক চণ্ডীর পর্য্যায়ে গিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার নাম হইল বিশালাক্ষী। বস্তুতঃ 'বিশালাক্ষী' বলিয়া পার্ব্বতীর কোন একটি নাম প্রামাণ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং পার্ব্বতীর বিশেষণরূপে এই শব্দটি কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। 'বিশালাক্ষী' শব্দটি 'বাসুলী' বা 'বাসলী'-রূপে পরিণত হওয়াও ভাষাতত্ত্বের নিয়মবিরুদ্ধ। বঙ্গদেশে এক সময়ে বজ্রযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের বিশেষ প্রভাব হইয়াছিল। ইঁহারা 'বজ্রসত্ত্ব' নামক ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির উপাসনা করিতেন এবং বজ্রসত্ত্বেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে বুদ্ধশক্তিরও অর্চ্চনা করিতেন। আমাদের

বাসুলী ও মঙ্গলচণ্ডী বৌদ্ধ বজ্রেশ্বরীর পরিণতি

বোধ হয়, এই বজ্রেশ্বরী দেবীই বজ্রসরী—বাজসরী—বাজসলী—বাসলী বা বাসুলীতে পরিণত হইয়াছেন এবং পরে ইনিই পৌরাণিক চণ্ডীর স্থান অধিকার করিয়া, মঙ্গলচণ্ডীরূপে বঙ্গবধূগণের বিবিধ ব্রতে এবং তাহা হইতে চণ্ডীকাব্যে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন। বৌদ্ধ দেবতার প্রধান চিহ্ন ডোম প্রভৃতি নিম্ন-জাতীয় পুরোহিত। কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বঙ্গের বহু স্থানে মঙ্গলচণ্ডীর ডোমজাতীয় পূজক ছিল। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলেন,—"আমরা ডোমজাতীয় স্ত্রীলোককে চণ্ডীর পূজা করিতে দেখিয়াছি, তাহাদিগকে দেআসিনী বলে।" মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও ডোমজাতীয় স্ত্রীলোকের চণ্ডীপূজা করিবার কথা লিখিত আছে।[১] মাণিক দত্তের রচিত চণ্ডীকাব্য মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ইহাতে দেখা যায়, শূন্যপুরাণের আদ্যাদেবী ও মঙ্গলচণ্ডী এক দেবতা। বৌদ্ধ ধর্ম্মঠাকুরের নিকট কিছু দিন পূর্ব্বেও শূকর বলি দেওয়া হইত। ক্রমে ধর্ম্মঠাকুরের শিবত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহা উঠিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ শূকর বলি, বৌদ্ধদেবতার আর একটি প্রধান লক্ষণ। হিন্দুর দেব-দেবীর নিকট শূকর বলি দিবার বিধান হিন্দুশাস্ত্রে থাকিলেও তাহা তত প্রচলিত নহে।[২] মঙ্গলচণ্ডী যদিও আজকাল শূকরবলি গ্রহণ করেন না, কিন্তু কবিকঙ্কণের সময়ে করিতেন। গঙ্গা ও চণ্ডীর কোন্দলের সময়, গঙ্গা চণ্ডীকে বলিতেছেন,—"তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।" মঙ্গলচণ্ডী যে বৌদ্ধ দেবতা, এই সকল প্রমাণের দ্বারা তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে আরও অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবের আভাস পাওয়া যায়। তাহা আমরা চণ্ডীকাব্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে যথাস্থানে দেখাই-বার চেষ্টা করিব।

বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আসিয়া লৌকিক চণ্ডী, পৌরাণিক চণ্ডীর স্থান অধিকার করিলেও, লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল পৌরাণিক চণ্ডীমাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই। লৌকিক

১ ধর্ম্মমঙ্গল, জাগরণ পালা দ্রষ্টব্য।

২ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ, বি এ মহাশয়ের নিকট অবগত হইলাম যে, কামাখ্যাদেবীর নিকট পূর্ব্বে শূকর বলি হইত, ইহা তিনি শুনিয়াছেন।

চণ্ডী যে খাঁটি পৌরাণিক চণ্ডী নহেন, ইহা দ্বারাও তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে পৌরাণিক ধর্ম্মের অবনতির সময়, লৌকিক চণ্ডী নিজ প্রসার বৃদ্ধি করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পৌরাণিক ধর্ম্মের আদর যখন আবার বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি নিজেকে দৃঢ় করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন।

মঙ্গলচণ্ডী নামের ব্যাখ্যা

তাই আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও কালিকাপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা এবং ব্রতবিধি ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে কালকেতু ও শালবাহনের উল্লেখ দেখিতে পাই।[১] 'মঙ্গলচণ্ডী' নামটি অপৌরাণিক অর্থাৎ প্রাচীন পুরাণে এই নাম পাওয়া যায় না। সেই জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[২] যিনি মঙ্গল বিষয়ে নিপুণা অথবা যিনি মঙ্গল নামক রাজার ইষ্ট-দেবী, তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডিকা। মাধবাচার্য্যের জাগরণে ইহার অনুরূপ অর্থ দেখা যায়। তিনি বলেন,—

মঙ্গল দৈত্য বধি মাতা হৈলা মঙ্গলচণ্ডী ॥

পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত লৌকিক চণ্ডীর তুলনায় আলোচনা এইখানেই শেষ হইয়া গেল। পরে এ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা আবশ্যক হইলেও, এইখানেই আমরা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অপর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বৌদ্ধ বজ্রযান মত নানা কারণে বঙ্গদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সে সব কারণের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাহার দেবতা বজ্রেশ্বরী বঙ্গদেশে নিজের ভিত্তি-মূল এতই

মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের উৎপত্তি

দৃঢ় করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তুলিয়া ফেলিতে কেহ সমর্থ হয় নাই। সেই ভিত্তির উপর চূণকাম করিয়া এবং তাহাতে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বসাইয়া বাঙ্গালায় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের উদ্ভব হইয়াছে। এই ব্রত অদ্যাপি সমস্ত বঙ্গে জয়মঙ্গলচণ্ডী, হরিশমঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বিবিধ নামে প্রচলিত আছে।

নূতন কোনও ধর্ম্মমত বা দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, তাহাকে লোকরঞ্জন করিয়া গড়িয়া তোলা আবশ্যক। অথবা এমন কোন একটা জিনিষ তাহাতে থাকা চাই, যাহা লোকের

লৌকিক চণ্ডীর প্রভাব ও তাহার কারণ

মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ। নতুবা তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম, প্রেমের মাধুর্য্যে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। চৈতন্যদেব প্রেমের অবতার বলিয়া লোকের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মঙ্গলচণ্ডীতে এরূপ আকর্ষণের কি আছে, যাহাতে লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? তাই

---

১ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪১ অধ্যায়। ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি, যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা। শ্রীশালবাহননৃপাদ্বণিজঃ সসূনোঃ রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী।—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, ২১০ পৃঃ।

২ মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা।......মঙ্গলাভীষ্টদেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা। মঙ্গলো মনুবংশশ্চ সপ্তদ্বীপধরাপতিঃ। তস্য পূজ্যাভীষ্টদেবী তেন মঙ্গলচণ্ডিকা।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড।

মঙ্গলচণ্ডীর সেবকগণ তাঁহাকে ভক্তবৎসল করিয়া গড়িয়াছেন। তিনি নিজের পূজা প্রচারে যেমন ব্যস্ত, ভক্তকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতেও তেমনি তৎপর। কালকেতু কলিঙ্গ-কারাগারে যেমন তাঁহাকে স্মরণ করিল, অমনি "সঘন স্পন্দন করে দেবীর বাম পায়॥" আবার শ্রীমন্ত যখন তাঁহাকে সিংহলের দক্ষিণ মসানে প্রাণের দায়ে ডাকিতেছেন, তখন দেবীর "মুখ হইতে খসে পান, স্থির নহে মন প্রাণ, আসন করয়ে টলবল॥" শুধু ইহাই নহে, ভক্তের জন্য তিনি কাকরূপ ধারণ করিয়াছেন, বনে ছাগল চুরি করিয়াছেন, গোধিকা হইয়াছেন। এক কথায় ভক্তের জন্য তাঁহার দিনে আহার এবং রাত্রে ঘুম নাই। এহেন ভক্তবৎসল, ভক্তের জন্য যাঁহার এতটা মমতা, তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িতে কত দিন? বঙ্গীয় কুলবধূ এবং কোমল-মতি বঙ্গবাসিগণ চণ্ডীর এই গুণেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সময়ে বাঙ্গালীর উপর মঙ্গলচণ্ডীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল, চৈতন্যভাগবতে ইহার বর্ণনা আছে[১]। আজকালও ইহাঁর প্রভাব একেবারে কম নহে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অংশ যে ইহাঁর কৃপায় বিশেষ পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন বাঙ্গালায় যে শৈব সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ শিবের নির্লিপ্ততা। চাঁদ সদাগরের বিপদে শিবের হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নাই। ধনপতি সদাগর সিংহলে যাত্রাকালে, নানাবিধ অমঙ্গল দেখিয়া, "কি করিবে আনে যার সহায় শঙ্কর॥" বলিয়া শিবের প্রতি অগাধ ভক্তির পরিচয় দিলেন, কিন্তু শিব তাঁহাকে চণ্ডীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিলেন না। এই দুই ভক্তের প্রতি শিবের নির্ম্মম ব্যবহার যেমন নিন্দনীয়, পক্ষান্তরে ভক্তযুগলের ইষ্টদেবে ভক্তিও সেইরূপ প্রশংসার যোগ্য।

পৃথিবীর যাবতীয় জিনিষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন জিনিষই একেবারে পূর্ণ বিকশিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। চণ্ডীকাব্যের জন্ম, বিকাশ ও পরিপুষ্টিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া হয় নাই। চণ্ডীকাব্যের বীজ প্রথম মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথাতেই নিহিত ছিল; কবির পর কবির হাতে পড়িয়া সেই ব্রতকথা ক্রমে কাব্যে পরিণত হইয়াছে। কবিকঙ্কণ, মাধব এবং জনার্দ্দন, এই তিন জনের চণ্ডীকাব্য পাঠ করিলেই ইহা অতি সহজে বুঝা যাইবে। একটু পরে জনার্দ্দনের চণ্ডী হইতে আমরা অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে, উহা কাব্য নহে—ব্রত-কথামাত্র। ইহার পর মাধবের চণ্ডীতে কাব্যের সূত্রপাত, কবিকঙ্কণে তাহার চরম পরিপুষ্টি।

চণ্ডীকাব্যের উৎপত্তি

---

১ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহু ধনে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।—চৈ° ভা°, আদি, ২ অ°।

আমাদের দেশে অনেক বড় বড় জিনিবেরই ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। এরূপ অবস্থায় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের জন্মের সন-তারিখ ঐতিহাসিকগণের নিকট চাহিলে, তাহা তাঁহারা দিতে পারিবেন কি না, জানি না। সুতরাং এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে আমরা অসমর্থ।

মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের প্রাচীনত্ব

তবে আমাদের অনুমান হয় যে, মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের উৎপত্তির সময় তখনই, যখন বাঙ্গলার স্বাধীনতা-রত্ন বিদেশীয় নৃপতির চরণতলে লুটাইয়া পড়ে নাই। তখন তাহার বাণিজ্য ছিল, বাণিজ্য-তরী মধুকর ছিল, বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র-পারে গিয়া তখন সে পতিত হইত না, দেশে লক্ষপতির অভাব ছিল না, অন্নের জন্য হাহাকার ছিল না, রোগ-শোকে দেশ তখন শ্মশান হয় নাই; বাঙ্গালীর মনে তখন জোর ছিল, শরীরে বীর্য্য ছিল, তাই সে অপর ধর্ম্মের দেবতাকে নিজ ধর্ম্মে মিশাইয়া লইতে পারিয়াছিল।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা কাব্যাকারে কখন্ বিরচিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার কোন ঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে চৈতন্যদেবের সময়ে চণ্ডীর গীত প্রচলিত ছিল এবং সেই গীত গাহিয়া লোকে জাগরণ করিত, চণ্ডীর পূজা করিত, এ কথা আমরা চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি।[১] চণ্ডী এবং বিষহরীর পূজায় তখন বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন হইত, উক্ত গ্রন্থের বর্ণনায় ইহারও আভাস পাওয়া যায়।[২] সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই যে, চণ্ডীকাব্য লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা অনুমান করিলে বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে কোন্ ভাগ্যবান্ এ বিষয়ে প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই। দ্বিজ জনার্দ্দনের চণ্ডীকাব্য ব্রতকথার আকারে লিখিত এবং খুব ছোট বলিয়া, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহাকেই প্রাচীন বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হয় না। সংক্ষিপ্ত এবং ব্রতকথার আকারে লিখিত চণ্ডীকাব্যই যে প্রাচীন হইবে, তাহা ঠিক নহে। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেও অনেক কবি চণ্ডীকাব্য লিখিয়াছেন, তাহা ব্রতকথার মত ছোট; এরূপ দুই তিনখানি পুথি আমরা দেখিয়াছি। জনার্দ্দনের চণ্ডীও এই জাতীয় হওয়া অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ ব্রতকথার মত ছোট

---

১ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।—চৈ° ভা°, আদি, ২ অ°।

২ চৈতন্যদেব শ্রীধরের দারিদ্র্য দেখিয়া তাহাকে বলিতেছেন,—
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি।—চৈ ভা, আদি, ৮ অধ্যায়।

ইহার পর চণ্ডী এবং বিষহরীর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন,—
দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নাগরিয়া।— ঐ ঐ।

চণ্ডীকাব্য হইলেই তাহা প্রাচীন হইবে না—কোন্ কাব্য কত প্রাচীন, তারিখ না থাকিলে তাহা অন্য উপায়ে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। মঙ্গলচণ্ডী বৌদ্ধ দেবতা, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময় মঙ্গলচণ্ডী—হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয়ের উপাস্য হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণ ইহাঁকে একেবারে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর সামিল করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কালে মঙ্গলচণ্ডী এরূপ ছিলেন না—তাঁহার উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সুতরাং যে চণ্ডীকাব্যের উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যত বেশী দেখা যাইবে, আমাদের মতে তাহাকেই তত অধিক প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত। আমাদের সংগৃহীত চণ্ডীকাব্যগুলির মধ্যে মাণিকদত্তের রচিত চণ্ডীতেই অধিক বৌদ্ধ-প্রভাব দেখা যায়, সুতরাং তাহাকেই আমরা প্রাচীন চণ্ডীকাব্য বলিয়া স্থির করিলাম।

১। মাণিক দত্ত

মাণিক দত্তের নিবাস ছিল মালদহের অন্তর্গত ফুলুয়া গ্রামে। ইনি কোন্ সময়ের লোক বা কখন্ ইনি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে চণ্ডীকাব্যের লেখকদের মধ্যে ইনি যে খুব প্রাচীন, ইহাঁর কাব্যের সৃষ্টি-বর্ণনা এবং চণ্ডীর উৎপত্তি ব্যাখ্যায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইনি আদি-ধর্ম্ম বা আদি-বুদ্ধ হইতে মঙ্গলচণ্ডীকে উৎপন্ন বলিয়াছেন এবং তাঁহার আর একটি নাম আদ্যা দেবী। এই আদ্যা দেবী বা মঙ্গলচণ্ডী শূন্যপুরাণের আদ্যা দেবীর সহিত অভিন্ন এবং কবির সৃষ্টি-বর্ণনাও শূন্যপুরাণের অনুরূপ। সৃষ্টিবর্ণনাটি এই,—

সৃষ্টিপত্তন

অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে। হস্ত পদ নাহি ধর্ম্মের ভ্রমে নৈরাকারে॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই গোলক ধিয়াইল। গোলক ধিয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই শূন্য ধেয়াইল। শূন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের শরীর হইল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই হুহিত ধিয়াইল। হুহিত ধিয়াইতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হৈল॥
জন্ম হইল ধর্ম্ম গোসাই গুণে অনুপমা। পৃথিবি সৃজিঞা তেঁহো রাখিবে মহিমা॥
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পরিল। হস্ত পদ পৃথিবীতে জল উপজিল॥
জলেতে আসন গোসাই জলেতে বৈসন। জল ভর করিয়া ভাসেন নিরঞ্জন॥
ভাসন্তে ধর্ম্ম গোসাই পাইল ঠেসন। চৌদ্দ যুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ॥
ধর্ম্মের ঠেসন হৈতে উলুক জন্মিল। জোড় হস্ত করি উলুক সমুখে ডাড়াইল॥
হাসঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায়। কহ কহ উলুক কত যুগ জায়॥
জত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে। তখনে আছিলাঙ আমি মন্ত্র ধিয়ানে॥
মন্ত্র ধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর। চৌদ্দ যুগের কথা শুন আমার গোচর॥

চৌদ্দ যুগের কথা তুমি সুন নৈরাকার। এ তিন ভুবনে পাতক নাহি আর ॥
সম্মুখে রচিল গোসাই পদ্মফুল। তাহাতে বসিঞা গোসাই জপে আত্মমূল ॥
নানা পত্র বহ্যা গেল পাতাল ভুবন। পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন ॥
দ্বাদশ বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল। হস্তে করি মৃত্তিকা শরীরে বুলাইল ॥
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেত করিঞা। শূন্যাকারে ধর্ম্ম গোসাই উঠিল ভাসিঞা ॥
পুনরপি আসিঞা পদেত কৈল ভর। মনে মনে চিন্তে গোসাই ধর্ম্ম নিরাকার ॥
মনে মনে চিন্তি তবে ধর্ম্ম অধিপতি। কার উপর স্থাপিব নির্ম্মাণ বসুমতী ॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজযুক্ত হৈল। গজের উপরে বসুমতীকে স্থাপিল ॥
গজ সহিতে পৃথিবী জায় রসাতল। আপনে ধর্ম্ম গোসাই কূর্ম্মরূপ হৈল ॥
কূর্ম্মের উপরে পৃথিবী রাখিল। ... ...
কূর্ম্ম সহিতে নারে পৃথিবীর ভার। গজ কূর্ম্মে পৃথিবী জায় রসাতল ॥
টানিঞা ছিড়িল গলের কনক পৈতা। এক গোটা নাগ হৈল সহস্রেক মাথা ॥
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন। তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভুবন ॥ ইত্যাদি

এইরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ এবং আদি-ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন আদ্যা দেবী যে হিন্দুর নহে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়—কালকেতু এবং শ্রীমন্তের উপাখ্যান; পুথি আকারে তত বড় নহে, ১৭৫ পাতা মাত্র। এই চণ্ডী কিছু দিন পূর্ব্বেও মালদহ অঞ্চলে, হিন্দুর গৃহে উৎসবাদি উপলক্ষে গান করা হইত। কবিকঙ্কণের রচনা ইহার মধ্যে কোথাও কোথাও অবিকল উদ্ধৃত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ইহার প্রাচীনত্বের হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, কবিকঙ্কণ হয় ত এই চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া তাঁহার কাব্য লিখিতে পারেন বা পরবর্ত্তী কালের গায়কেরা কবিকঙ্কণের রচনা ইহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিতে পারে। মাণিকদত্ত প্রথমে খোঁড়া এবং কাণা ছিলেন, পরে দেবীর অনুগ্রহে তিনি সুন্দর দেহ লাভ করেন। ইনি কলিঙ্গরাজের কারাগারে বন্দী হইয়াছিলেন। সেখান হইতে চণ্ডী তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া রাজার নিকট নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করেন[১]।

২। বলরাম কবিকঙ্কণ

মাণিক দত্তের প্রাচীন চণ্ডীকাব্যের পর বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীর সংবাদ পাওয়া যায়। এই চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ১৩০২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার অস্তিত্বের সংবাদ দিয়াছেন[২]। আজ পর্য্যন্ত

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

২ বিদ্যানিধি মহাশয় এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ীতে ইহার একখানি অসম্পূর্ণ পুথি দেখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ইহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

ইহার সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ আমরা দিতে পারিলাম না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু[১]।" মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের বন্দনা অংশে "বন্দিলু গীতের গুরু শ্রীকবি-কঙ্কণ" এই ছত্রটি দেখিয়া, ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু অনুমান করেন, —বলরামের চণ্ডীকাব্য অবলম্বন করিয়াই মুকুন্দ তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন[২]। এ সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই; কাজেই বলরামের চণ্ডী পাওয়া না গেলে ইহার বিচার করা যাইতে পারে না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে বলরামের কয়েকটি ভণিতা এখানে তুলিয়া দিলাম।

(ক) অভয়ার অভয় চরণে করি ধ্যান। বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

(খ) দক্ষমুখে সরস্বতী, নিন্দন শুনিয়া অতি, সদানন্দ শিবের মহিমা।
শিবনিন্দা শুনি কোপে, নন্দীশ্বর ধায় দাপে, বিরচিল কবি বলরামা ॥

(গ) অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। দ্বিজ বলরাম গান মধুর সঙ্গীত ॥

নীচের চারিটি ছত্রে তাঁহার রচনার নমুনাও কিছু পাওয়া যায়,—

শুন সতি পশুপতি ছাড়িয়া কৈলাসে। কোন্ গুণে অপমানে যাবে পিতৃবাসে ॥
ত্রিনয়ন নিবেদন শুন গুণবতি। দেবনিন্দা শিববৃন্দে দক্ষ প্রজাপতি ॥

৩। মাধবাচার্য্য বা মাধবানন্দ

পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত সপ্তগ্রাম;—তাহার মধ্যে ত্রিবেণীর তীরে মাধবাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল পরাশর, পিতামহের নাম ধরণীধর বিশারদ। পরাশর, জপ-তপ এবং যাগ-যজ্ঞ-পরায়ণ, দানশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল, কবির বর্ণনায় ইহা আমরা জানিতে পারি। কবির জন্মের তারিখ পাওয়া যায় না বটে,

কবির পরিচয়

কিন্তু তিনি আকবর এবং মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের সমসাময়িক লোক। ১৫০১ শক বা ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে, মেঘনা নদীর তীরে, নবীনপুর গ্রামে মাধবাচার্য্য গিয়া বাস স্থাপন করেন[৩]। ইঁহার পুত্রের নাম ছিল জয়রামচন্দ্র গোস্বামী। কবি তাঁহার গ্রন্থে যে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম।—

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা।

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪১৭ পৃ°।

৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫১৭ পৃঃ।

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অৰ্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি। কলিযুগে রাম তুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল। ত্রিবেণীতে গঙ্গা দেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী-তটবাসী পরাশর। যাগ যজ্ঞ জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য। ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায়ে গান। তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
শ্রুতিতালভঙ্গ অন্য দোষ নাহি নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতু শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত॥
সারদার চরণ-সরোজ-মধু লোভে। দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে॥

ইহা ছাড়া কবির সম্বন্ধে আর কোন বিষয় জানিতে পারা যায় না। কবির সৃষ্টিপত্তনের প্রস্তাবনা অংশ এই,—

না আছিল রবি শশী, সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি, না আছিল সুমেরু মন্দার।
না আছিল সুরাসুর, রাক্ষস কিন্নর নর, কেবল আছিল শূন্যাকার॥
অক্ষয় অব্যয় হয়, যেই সেই মহাশয়, নিরঞ্জন পুরুষপ্রধান।
আপনি চৈতন্য হৈয়া, বেড়ায় জলে ভাসিয়া, সৃষ্টি সৃজিতে দিলা মন॥
সৃষ্টি সৃজিতে চায়, নিজ গায়ের মলায়, তথিতে করিল পদভর।
ও পদের ভর পায়্যা, যায় পৃথ্বী বিদারিয়া, ভাসে ক্ষিতি জলের উপর॥
যতেক এ সংসার, কিরূপে সৃজিব আর, মনে মনে ভাবে ভগবান্।
সৃষ্টি সৃজন আশে, জলে পূর্ণবিম্ব ভাসে, নখে ছিঁড়ি কৈলা দুইখান॥
তাঁহার ইচ্ছায় সব, হইলেক উদ্ভব, আকাশাদি ভূতের প্রধান।
সেই অণ্ড ছিন্ন ভিন্ন, করিয়া ত নিরঞ্জন, পরে সৃষ্টি করিলা সংস্থান॥
সৃষ্টি সৃজিবার আশে, দেবীরে জন্মাইলা শ্বাসে, নাভিতে জন্মিলা প্রজাপতি।
করে জপমালা লইয়া, অন্তরে হরিষ হইয়া, ধ্যানে নিবেশ কৈলা মতি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকায়, তাহাতেই জন্ম পায়, বলে দেবী দিব কার স্থানে।
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী, বলে দেব চক্রপাণি, দেবী সমর্পিব ত্রিলোচনে॥ ইত্যাদি।

উপরে লিখিত প্রথম দুই ছত্রের সদৃশ ভাব যদিও ঋগ্বেদের "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং" ইত্যাদি সূক্তে পাওয়া যায়, তথাপি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে এইরূপ কথা যেন বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত শূন্য-বাদেরই প্রভাব ইঙ্গিত করিতেছে। বিশেষতঃ রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের "নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্" ইত্যাদি সৃষ্টিপত্তনের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। গায়ের মলায় সৃষ্টি সৃজন, শ্বাসে দেবীর জন্ম, নখে ছিঁড়িয়া দুইখান করা প্রভৃতি কথা স্পষ্টই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সূচনা করে, ইহা

কাব্যে বৌদ্ধ-প্রভাব

কখন হিন্দুর শাস্ত্রসঙ্গত কথা নহে। ইহা ছাড়া মাধবের চণ্ডীতে খুল্লনা দুই জায়গায় "ধর্ম্মের ঝি" বলিয়া কথিত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,—"অন্তরীক্ষে চণ্ডী বলে খুল্লনা ধর্ম্মের ঝি। বিশাইর গঠন নৌকা মনে ভাব কি॥"—২১৬ পৃঃ। মাধবের কালকেতু বলিতেছে,—"ধরিয়া ধবল ছত্র, বীরমুখে শুনি শাস্ত্র, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ব্রতকথা॥"—৯০ পৃঃ। চণ্ডীর বড় সাধের সেবক শ্রীমন্ত সিংহলে গিয়া বলিতেছে,—"সত্য কহিতে যদি বধহ জীবন। অচিরাতে ফল দিবে ধর্ম্ম নিরঞ্জন॥"—২৪৭ পৃঃ। মাধবাচার্য্যের সময়ে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছিল না বটে, কিন্তু তাহার প্রভাব কিছু কিছু ছিল; অন্ততঃ কবি যে কতকটা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাঁহার রচনাই তাহার প্রমাণ দিতেছে। হয় ত তিনি এই সকল কথা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলিয়াই লিখিয়া থাকিবেন। কেন না, তাঁহার জন্মের বহু পূর্ব্বেই এই সকল বৌদ্ধ মতের কথা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল।

মাধবের চণ্ডীকাব্য আকারে তত বড় নহে। কবিকঙ্কণচণ্ডীর তুলনায় ইহা খুব ছোট। কিন্তু ইহার মধ্যে আমরা এমন সকল জিনিষ পাই, যাহা মুকুন্দের কাব্যে দুর্লভ। মুকুন্দের চণ্ডীতে কতকটা পৌরাণিক চণ্ডীর ভাব আছে, মাধবের চণ্ডী নিরাভরণা—অনেকটা মানবীয় চরিত্রের ছাঁচে ঢালা। ঘটনার বিস্তার এবং কবিত্ব-শক্তির তুলনায় মাধব, মুকুন্দরামের সমকক্ষ না হইলেও, অল্প কথায় তিনি যে সকল ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কবিকঙ্কণের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিয়াও আমরা সেইরূপ ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই না। মুকুন্দের সহিত মাধবের তুলনায় সমালোচনা করিলে, আমরা মুকুন্দকেই বড় দেখিতে পাই। কিন্তু মুকুন্দকে দূরে রাখিয়া যদি আমরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাধবের কাব্য পাঠ করি, তবে তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। মাধবের কাব্যের চরিত্রগুলি কবিকঙ্কণের কাব্যোক্ত চরিত্রের নিকট বড়ই অস্পষ্ট। কিন্তু সেই অস্পষ্টতার মধ্যেও কবির আঁকিবার কৌশলে তাহা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দের কাব্য প্রস্ফুটিত পদ্মবন, মাধবের রচনা তাহার নিকট গোলাপের স্তবকরূপে উপস্থিত হইতে পারে। উভয়ের কাব্যে ঘটনাগত অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকিলেও, ইহাঁদের মধ্যে এমন একটা একতা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে উভয় কবিকে এক বংশের লোক বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একজন নিজের পুরুষকারে উন্নত, অপর জন পৈতৃক ধনের অধিকারী মাত্র। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই কথা বলিয়াছেন। প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া মাধব যে ক্ষুদ্র চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, কবিকঙ্কণ নিজের প্রতিভার তুলিকায় এবং অঙ্কণবৈচিত্র্যে নিপুণ ভাবে তাহাতে রং ফলাইয়াছেন মাত্র। এই হিসাবে মুকুন্দ প্রথম এবং মাধব দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির আসন পাইবার উপযুক্ত।

মাধব ও মুকুন্দ

মাধব, করুণ বিষয়ের রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক যে সকল ধুয়া তিনি তাঁহার কাব্যের মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা অতীব

উৎকৃষ্ট ধুয়া

মর্ম্মস্পর্শী। আমার বোধ হয়, এই সকল ধুয়া, বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের যে-কোন উৎকৃষ্ট পদের সহিত তুলিত হইতে পারে। নমুনা দেখুন,—

১। বন্ধু তোমার বদলে থুইয়া যাও বাঁশী।
তবে সে আসিবা প্রভু হেন মনে বাসি॥
এ বাঁশী যতনে থোব গন্ধ চন্দন দিয়া।
যতনেতে হিরা মণি রতনে জড়িয়া॥
যখনে তোমার তরে　　মরমে বেদনা করে
শোক দুঃখ নিবারিব বাঁশী বুকে দিয়া॥

২। হেন সাধ করে নাইয়র হেন সাধ করে।
হৃদি চিরি তার মাঝে রাখিতে তোমারে॥

৩। আঁখি মেলিতে নারি গুরু জনের ভয়।
যে দিগে পড়য়ে দৃষ্টি সে দিকে শ্যাম রায়॥

৪। কাল ভ্রমরা রে যথা মধু তথা চলি যাও।
আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও॥
যে কথা কহিবে প্রভুর ঘনাইয়া কাছে।
সুস্থির সম্ভ্রমে কেও লোকে শুনে পাছে॥
চরণ-কমলে শত জানাইয়া প্রণাম।
অবশেষে জানাইও রাধার নিজ নাম॥

৫। বড়াই মাই লো গাও মোর কেমন কেমন করে।
তখনে বলিলুম আমি না যাইমু কদমতলে রে॥

৬। বিনোদিনি বিলম্ব করিতে না জুয়ায়।
তুয়া পন্থ নিরক্ষিতে　　রহিয়াছে প্রাণনাথে
রাধা বলি মুররি বাজায়॥

স্বাভাবিক বর্ণনায় মুকুন্দরাম অদ্বিতীয়। মাধব এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত না হইলেও, মুকুন্দের নীচেই মাধবের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। মাধবের কাব্য মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণনার সৌন্দর্য্যে পাঠক মুগ্ধ হইবেন। বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের মত বর্ণনার অস্বাভাবিকতা ইনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। ব্যাধ-পত্নীগণের চিত্র আঁকিবার সময় ইনি তাহাদিগকে ব্যাধ-পত্নীরূপেই আঁকিয়াছেন, তিলফুল-নাসা, মৃগরাজ-কটি বা কুরঙ্গ-নয়ন এ সময়ে তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। ছুলি, খুলি, পেলি প্রভৃতি ব্যাধ-সুন্দরীগণের তিনি যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একেবারে নির্খুৎ। কবির কল্পনা এখানে যেন একখানি জীবন্ত ছবি আনিয়া আমাদের সামনে ধরিয়া দিয়াছে। পরপৃষ্ঠায় নমুনা দেখুন।

বর্ণনার স্বাভাবিকতা

ছলি খুলি পেলি আয়ী আইল তার ঘরে।
মৃগচর্ম্ম পরিধান দুর্গন্ধ শরীরে॥
কড়ির মালা পরে গলে রাঙ্গের অলঙ্কার।
ভেলার চিহ্ন অঙ্গে ধরে ওর-ফুলহার॥
কোন আয়ী আসি ডউয়ার ছাল খায়।
বদন করিয়া রাঙ্গা বীরের কাছে যায়॥

মাধবের কাব্যের কোন অংশই মুকুন্দের চণ্ডীর মত বিস্তৃত নহে। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়, অল্প কথায়, সামান্ত বিষয়ে তিনি যে কবিত্বের বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রেষ্ঠ কবির রচনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মাধব তাঁহার কাব্যে অতি সতর্কভাবে স্বভাবের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এই লক্ষ্য তাঁহার এতই প্রখর যে, সামান্য একটি বিড়ালের গতি পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই,—"ঠেলাঠেলি ফেলা-ফেলি কেহ নাহি খায়। মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চোকে চায়॥ ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে। মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ীর পিছে॥" কবি, ব্যাধ কালকেতুর বিবাহ বর্ণনা করিবেন, এখানে তাহার দানসজ্জায় পালংখাট ও মণি-মাণিক্য বা বিবাহের রন্ধনে ক্ষীর-সর, পোলাও-কালিয়ার নাম করিলে তাহা স্বাভাবিক হইবে না। তাই তিনি লিখিয়াছেন,—"দানসজ্জা আনি দিল সভা বিগুমানে॥ ভাঙ্গা নারিকেল দিল জীর্ণ ধনুখান। বসিবারে মৃগচর্ম্ম দিল বিগুমান॥" রন্ধনে—"পাবক জ্বালায়ে রামা হইয়া হরষিত। পাকা কলার মূল রান্ধে লবণবর্জ্জিত॥ পাকা পুঁইশাক রান্ধে পিঠালি মিশালে। সম্ভার করয়ে তারে শূকরের তৈলে॥ কৃষ্ণসার-মাংস রান্ধি হরষিত মন। তণ্ডুল-কণার অন্ন রান্ধি ততক্ষণ॥" ইত্যাদি। প্রাচীন কবিগণের অস্বাভাবিক বর্ণনার পাশে মাধবাচার্য্যের এইরূপ স্বভাব-বর্ণনায় তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্য যে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাভাবিক বর্ণনার স্থায় নারী-চরিত্রের অঙ্কণেও ইনি দক্ষ। যদিও ইহাঁর কাব্যে খুল্লনা এবং লহনার চরিত্র তত পরিস্ফুট নহে, তথাপি তাহাদের চরিত্রে রমণীজনোচিত কোমলতা এবং মাধুর্য্যের অভাব নাই। এই দুইটি চরিত্র তিনি বাঙ্গালীর ঘরের মত করিয়াই আঁকিয়াছেন। রাঘব দত্তের প্ররোচনায় ধনপতির জ্ঞাতিগণ খুল্লনাকে পরীক্ষা করিয়া নানারূপ কষ্ট দিয়াছিল। পরীক্ষান্তে সকল জ্ঞাতিকেই ধনপতি, বস্ত্র-আভরণ ব্যবহার দিলেন,—কেবল দিলেন না রাঘবকে। রাঘব দরিদ্র, সে বস্ত্র পাইবে না, কোমলমতি খুল্লনার প্রাণে ইহা সহিল না। হউক না সে শত্রু, কিন্তু সে যে দরিদ্র। তাই সে স্বামীকে বলিতেছে,—"রাঘব হতে তোমার রহিল জাতি কুল। অপকীর্ত্তি দূরে গেল শুদ্ধ হল কুল॥ তাঁরে ব্যবহারি দেওয়া চাহি সমুচিত। নতুবা তোমার দোষ হইবে ঘোষিত॥" পুরুষের কাঠিন্য এবং রমণীর কোমলতা এখানে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে।

কাব্যের চরিত্র

লহনা এবং খুল্লনার সপত্নী-ভাবও কবির কলমে বেশ ফুটিয়াছে। খুল্লনার স্বতুগৃহ-পরীক্ষায়

সকলেই কাঁদিয়া আকুল। কেবল—"লহনা সতিনী কাঁদে লোকাচার-ভয়ে। মনে ভাবে খুল্লনা যে মরুক নিশ্চয়ে॥" বালক শ্রীমন্তের চরিত্র ঠিক বালকের মতই, অধিকন্তু তাহাতে গভীর সত্যানুরাগ সন্নিবেশ করিয়া, তাহাকে সমধিক মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। "ধনপতি বলে প্রিয়া যাও তুমি ঘর। কি করিবে আনে যারে সহায় শঙ্কর॥" এই দুই ছত্রে মাধব, ধনপতির ইষ্টদেবে যে একান্ত নির্ভরতা দেখাইয়াছেন, কবিকঙ্কণের দীর্ঘ বর্ণনায়ও তাহা অপেক্ষা বেশী নির্ভরতা ব্যক্ত হয় নাই। বস্তুতঃ মাধবের কাব্যের চরিত্রগুলি যদিও ঘটনাবৈচিত্র্য বা বর্ণন-বাহুল্যে সমধিক ব্যক্ত হয় নাই, তথাপি তাহা কবিকঙ্কণের চরিত্র হইতে একেবারে নিকৃষ্ট নহে। বরং কবিকঙ্কণ অপেক্ষা কোন কোন চরিত্র তিনি অধিক সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। মাধবের ভাড়ুদত্ত কবিকঙ্কণ অপেক্ষা বেশী ধূর্ত্ত, কালকেতুর বিক্রম কবিকঙ্কণ হইতে মাধবের কাব্যে বেশী। যদিও নারী-চরিত্রের বর্ণনায় মাধব, মুকুন্দকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু পুরুষ-চরিত্র যে কবিকঙ্কণ অপেক্ষা মাধবের কাব্যে অধিক সবল, ইহা উভয় কাব্যের তুলনায় আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

ছন্দ

মাধবের কাব্যে ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী ও পয়ার, এই চারি রকম ছন্দই অবলম্বন করা হইয়াছে।

সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং সেই সময়কার দেশের অবস্থার আভাস মুকুন্দের কাব্যে যেরূপ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়, মাধবের কাব্যে সেরূপ নহে। মুকুন্দের মত, মনুষ্য-সমাজের বিস্তৃত জ্ঞান এবং ভূয়োদর্শিতাও মাধবের ছিল বলিয়া মনে হয় না। যদিও কবির নিকট ঐতিহাসিক ঘটনার যথাযথ বর্ণনা প্রত্যাশা করা অন্যায়, তথাপি ইহাও মনে রাখা উচিত যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব হইতে কবির রচনা অব্যাহতি পাইতে পারে না। কবির অভিজ্ঞতা অনুসারে তাঁহার অজ্ঞাতে সেই সময়কার যে সকল সমাজচিত্র তাঁহার রচনায় অঙ্কিত হইয়া যায়, পরবর্ত্তী কালে তাহা হইতে অনেক তথ্যের আবিষ্কার হইতে পারে।

কাব্যে সমাজ-চিত্র

মাধবের কাব্য অতিশয় সংক্ষিপ্ত বলিয়া, ইহার মধ্যে তখনকার সামাজিক অবস্থার ছাপ তত বেশী পড়ে নাই। তাঁহার কাব্য হইতে মোটের উপর জানা যায় যে, সাধারণ বেচা-কেনায় তখন কড়ির প্রচলন ছিল, বাঙ্গালী তখন পাগড়ী ব্যবহার করিত, ধনীরা বিলাসী ছিল, তাহারা কপালে গোপীচন্দনের ফোঁটা কাটিত, ধনী স্ত্রীলোকদের কাঁচলীতে দেবদেবীর নানা রকম চিত্র আঁকা থাকিত, তন্মধ্যে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চিত্রই অধিক। বড় লোকেরা দোলায় চড়িয়া গমনাগমন করিত। নৌকার মাঝীদের একটি নাম ছিল তখন "গাইতর"। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে "কন্যাদায়" ছিল না। খাবার জিনিসের মধ্যে এই কয়টি নূতন নাম পাওয়া যায়,—'সম্মোহন' নামে এক প্রকার ঘৃত, "উরিচা" এক রকম তরকারি। "নিমছরি" তিক্ত ও মিষ্ট-মিশ্রিত ব্যঞ্জন। সমুদ্রফণা, লালমৈলান, পুষ্প-পানি—এই তিন রকম পিঠা।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্য আমাদের এ অঞ্চলে তত বিখ্যাত নহে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে।

৪। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ

মুসলমান রাজগণের অধিকারকালে বাঙ্গালীর ঘরে অন্নের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু নিরুদ্বেগে ঘরে বসিয়া সেই অন্ন উপভোগ করা খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটিত। সাধারণতঃ মুসলমান রাজাদের মধ্যে সহৃদয় ও সমদর্শী ব্যক্তির অভাব না থাকিলেও স্থলবিশেষে রাজা ও রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারে দেশময় তখন একটা মূর্ত্তিমান্ আতঙ্ক বিরাজ করিত; ঘরে ভাত থাকিলেও, সেই আতঙ্কে হিন্দু, তাহা পেট ভরিয়া খাইয়া হজম করিতে পারিত না—শান্তি কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানিত না। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের জীর্ণ পত্র অনুসন্ধান করিলে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের এইরূপ অত্যাচারের বর্ণনা একবারে দুর্লভ নহে। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, সীতারাম দাসের মনসামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আজকালকার দিনে সেই পুরাণ কাসুন্দি ঘাটিয়া, মুসলমানের প্রতি হিন্দুর মনে একটা বিদ্বেষ-ভাব জাগাইয়া দেওয়া আমি অনুচিত মনে করি। তাই সে সকল বর্ণনা এখানে তুলিয়া দেখাইলাম না—অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য তাহা প্রাচীন সাহিত্যের জীর্ণ পত্রমধ্যেই নিবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

মুসলমানের অত্যাচার

আমাদের আলোচ্য কবি মুকুন্দরামের সময়ে বঙ্গদেশ প্রায় অরাজক অবস্থায় ছিল। গৌড় নগর তখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আফগানবংশীয় দাউদ খাঁর হাত হইতে বাঙ্গলার অধিকার তখন আকবরের হাতে গিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি তখনও দেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। নূতন অধিকৃত বঙ্গদেশে শাসন-শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে সকল কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা তত যোগ্য বা সহৃদয় ছিলেন না। শাসনকার্য্যে তাঁহাদের অক্ষমতা এবং অত্যাচারের জন্য দেশে তখন পূর্ণমাত্রায় অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী এই সময়ের একটি অত্যাচার-কাহিনী লিখিয়া, তাঁহার বিখ্যাত কাব্যের সহিত গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গে অরাজকতা

সিলিমাবাজ পরগণার অধীন দামুন্যা গ্রামে মুকুন্দরামের সাত পুরুষ ধরিয়া বাস[১]। দামুন্যা পল্লীর সহিত তাঁহার কত স্মৃতি, কত সাধ, কত আশা বিজড়িত। হঠাৎ মুসলমানের উপদ্রব আসিয়া তাঁহার সেই নিভৃত পল্লীতে উপস্থিত হইল—তাঁহার সকল সাধে বাদ সাধিল। মামুদ শরিফ নামক একজন মুসলমান এই সময়ে ডিহিদার নিযুক্ত হইয়া আসে[২]। ইহার অত্যাচারে প্রজারা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রজার কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, এই ব্যক্তি বিঘায় মাপ কমাইয়া পনের কাঠায় এক বিঘা ধরিতে লাগিল, সরকারেরা খিল জমী আবাদী

---

১ সহর সিলিমাবাজ, তাহাতে সজ্জনরাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ। তাঁহার তালুকে বসি, দামিন্যায় চাষ চষি, নিবাস পুরুষ ছয় সাত।—ক, ক, চ।

২ অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদার মামুদ শরিফ।—ক, ক, চ।

বলিয়া লিখিতে লাগিল।[১] কবি মুকুন্দের মুনিব গোপীনাথ নন্দী, বর্দ্ধিত খাজনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন।[২] উজীর রায়জাদা ব্যাপারীগণকে তাড়াইয়া দিল এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব দেখিলেই তাঁহাদিগকে অপমান করিতে আরম্ভ করিল।[৩] এই উপদ্রবে হাট-বাজার, কেনা-বেচা বন্ধ হইয়া গেল,[৪] সুবিধা বুঝিয়া পোদ্দারেরা টাকায় দশ পয়সা কম দিতে লাগিল এবং প্রতিদিন টাকায় এক পয়সা সুদ আদায় করিতে লাগিল। খাজনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া, প্রজারা ধান, গরু বেচিতে প্রস্তুত, কিন্তু খরিদ্দার নাই। অবশেষে নিরুপায় হইয়া, তাহারা টাকার জিনিষ দশ আনায় বেচিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল।[৬] পাছে প্রজারা পলাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সিপাহীরা পথ-ঘাট অবরোধ করিয়া রহিল।[৭] দেশের এইরূপ দুরবস্থায় মুকুন্দরাম তাঁহার সাধের দামুন্যায় বাস করা আর নিরাপদ্ বোধ করিলেন না। তিনি মুনিব খাঁর সহিত যুক্তি-পরামর্শ করিয়া, চণ্ডীগড়নিবাসী শ্রীমন্ত খাঁর সহায়তায় ভাই রামানন্দ ও স্ত্রী-পুত্রের সহিত দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।[৮]

দামুন্যায় অত্যাচার ও কবির দেশত্যাগ

তিনি দেশ ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল না। নৌকাযোগে তিনি যখন ভেঠনায় উপস্থিত হইলেন, তখন রূপরায় নামক এক দস্যু তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল; অবশেষে তিলি যদু কুণ্ডু আসিয়া দস্যুর হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করে। এই সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে নিজ গৃহে স্থান দান করিয়া উপকার করিয়াছিল এবং ইহার নিকট হইতে তিন দিনের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য লইয়া, কবি এখান হইতে যাত্রা করিলেন।[৯] এই সময় কবি অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, "তৈল বিনা কৈল স্নান, করিলুঁ উদক পান, শিশু কাঁদে ওদনের তরে" ইত্যাদি বর্ণনায় তাহা বেশ অনুভব করা যায়। অত্যাচারীর ভয়ে দেশ ছাড়িয়া মুকুন্দ পলায়ন করিতেছেন, পথে দস্যু আসিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। এই সময়ে কবির মনের অবস্থা কিরূপ, সহৃদয় মাত্রেই তাহা অনু-

কবির দুরবস্থা ও চণ্ডীর কৃপা

---

১ মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া, নাহি শুনে প্রজার গোহারি। সরকার হইলা কাল, খিল ভূমি লেখে লাল—ক, ক, চ।

২ প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।—ক, ক, চ।

৩ উজির হলো রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।—ক, ক, চ।

৪ ধান্ত গোরু কেহ নাহি কেনে।—ক, ক, চ।

৫ পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।—ক, ক, চ।

৬ প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি, টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।—ক, ক, চ।

৭ পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।—ক, ক, চ।

৮ সহায় শ্রীমন্তখাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ, যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, পথে চণ্ডী দিলা দরশনে।—ক, ক, চ।

৯ ভেঠনায় উপনীত, রূপরায় নিল বিত্ত, যদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, দিবস তিনের দিল ভিক্ষা।—ক, ক, চ।

স্তব করিতে পারেন। লোক যখন দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হয়, পার্থিব আশা-ভরসা যখন ফুরাইয়া যায়, তখন স্বভাবতই মন ভগবানের চরণে শরণ লইতে ব্যস্ত হইয়া থাকে। কবির এই সময়কার দুর্দ্দশাও চরম হইয়াছিল। তিনি একটি পুকুরের পাড়ে কুমুদ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, দগ্ধ শালুকের নৈবেদ্যে ইষ্টদেবের পূজা করিলেন এবং ক্ষুধা, ভয় ও পরিশ্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন।[১] সোনা যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া উজ্জ্বল হয়, মানুষের মনও সেইরূপ দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া নির্ম্মল হইয়া থাকে এবং মনের এইরূপ অবস্থায়ই দেবতার কৃপা অনুভব করা যায়। মুকুন্দও এই সময়ে স্বপ্নে চণ্ডীর দর্শন লাভ করিলেন এবং চণ্ডী তাঁহাকে দীক্ষা-মন্ত্র দান করিয়া গান রচনা করিতে আদেশ করিলেন।[২] মুকুন্দ সরল মনে এই দৈব আদেশে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সেই বিশ্বাসবশে লিখিত বলিয়াই তাঁহার কাব্য এত চমৎকার হইয়াছে।

ইহার পর গোড়াই নদী বাহিয়া তিনি তেউটায় উপনীত হন এবং ক্রমে দারুকেশ্বর, দামোদর নদ ও কুচট্যা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া আড়রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবি বাতন-গিরিতে উপস্থিত হইলে গঙ্গাদাস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার উপকার করিয়াছিল বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন।[৩] আড়রা ব্রাহ্মণ-ভূমি। তাহার অধিকারী রঘুনাথ রায়কে মুকুন্দ "ব্যাসের সমান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি মুকুন্দের কবিত্বে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পাঁচ আড়া ধান মাপিয়া দিলেন এবং ইহাঁর পিতা বাঁকুড়া রায় শিশুগণের শিক্ষকরূপে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।[৪] রঘুনাথ রায়ের আশ্রয় পাইয়া কবির সকল চিন্তা দূর হইল। রঘুনাথ তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন, দামোদর নন্দী তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাকে খুব যত্ন করিতেন।[৫] কবিকঙ্কণের অমর কাব্য এই রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়াই লিখিত হইয়াছিল। কবি তাঁহার প্রতিভার গুণে শিশু-

মুকুন্দ রাজকবি

শিক্ষকের পদ হইতে ক্রমে রাজার সভাসদ্ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে তিনি যেরূপ ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, পরপৃষ্ঠায় তাহার একটি তুলিয়া দিলাম।

---

১ আশ্রম পুখরি আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া, পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে……।—ক, ক, চ।

২ চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥……যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা।
……আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।—ক, ক, চ।

৩ দারুকেশ্বর তরি, পাইল বাতন-গিরি, গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত॥—ক, ক, চ।

৪ আড়রা ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি, পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়, শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।—ক, ক, চ।

৫ তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত॥
সঙ্গে দামোদর নন্দী, যে জানে স্বরূপ সন্ধি, অনুদিন করিত যতন।—ক, ক, চ।

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিকরাজ সুজান।
তাঁর সভাসদ রচি চারু পদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

মুকুন্দরামের আশ্রয়দাতা রাজা রঘুনাথ রায়ের পরিচয়, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে যতটা পাওয়া যায়, এখানে তাহা সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।—রঘুনাথ রায়ের বংশ "পালধিবংশ" বলিয়া খ্যাত[১] ছিল এবং ইহাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা রঘুনাথের পিতামহের নাম বীরমাধব, পিতার নাম বাঁকুড়া রায় এবং মাতার নাম দনা দেবী। দনা দেবী দুলালসিংহের কন্যা এবং বাঁকুড়া রায়ের অন্যান্য রাণীগণের মধ্যে ইনি প্রধানা ছিলেন[২]। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রঘুনাথের রাজসভায়ই প্রথম গীত হইয়াছিল এবং তিনি ইহার প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন[৩]। আড়রা গ্রাম এখন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল থানার অধীন। রঘুনাথের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন এবং আড়রা হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী "সেনাপতে" গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের সম্পত্তি এখন বর্দ্ধমানরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছে[৪]।

রাজা রঘুনাথের পরিচয়

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দৈবকী। হৃদয় মিশ্রের একটি উপাধি ছিল গুণরাজ[৫]। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কবিচন্দ্র নাম, কি উপাধি, তাহা ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। প্রাচীন পুথির মধ্যে 'কবিচন্দ্র' উপাধি অনেক দেখা যায়,—শঙ্কর কবিচন্দ্র, নিধিরাম কবিচন্দ্র, দ্বিজ গদাধর কবিচন্দ্র ইত্যাদি। বোধ হয়, মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও কবিচন্দ্র উপাধি থাকা অসম্ভব নয়। কবিকঙ্কণের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামানন্দ, কন্যার নাম যশোদা, জামাতা মহেশ, পুত্র শিবরাম, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা[৬]। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

---

১ জগদ্বন্তবংশে, পালধি বংশে, শ্রীনৃপতি রঘুরাম।—ক, ক, চ।

২ বীর মাধবের সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত, বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত, শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান।
দুলাল সিংহের সুতা, দনা দেবী পাটমাতা, কুলে শীলে রূপে অবদাত।
তার সুত নৃপরঙ্গ, করিল বহুত রঙ্গ, বৈরিশূন্য দেব রঘুনাথ।—ক, ক, চ।

৩ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিলু বন্ধ, রাজা কৈল মঙ্গল প্রকাশে।—ক, ক, চ।

৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ৪২৩ পৃঃ।

৫ মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন। তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।—ক, ক, চ। গুণরাজ মিশ্রসুত।—ঐ।

৬ উরিয়া কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে, চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।—ক, ক, চ।

মহাশয়, মুকুন্দের পঞ্চানন নামে আর এক পুত্র ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[১] কবি শৈশবে "শিবকীর্ত্তন" রচনা করিয়াছিলেন—"সেই ত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীত" এই ছত্র দেখিয়া তাহা জানিতে পারা যায়। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছিলেন, "সঙ্গীত-কলায় রত, সঙ্গীত অভিলাষী" ইত্যাদি ভণিতাই তাহার প্রমাণ। তাঁহার সঙ্গীত-গুরুর নাম ছিল রামাদিত্য।[২] কেহ কেহ বলেন,—"কবি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় সহ মাণিক দত্ত নামক এক অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।"[৩] তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল, এ কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দুই জায়গায় দুইটি ভণিতার ইঙ্গিতে ইহা জানিতে পারা যায়। লহনা এবং খুল্লনার বিবাদ-প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন,—"একজন সহিলে কন্দল হয় দুর। বিশেষ জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥" আবার লহনা যখন সখীর সহিত পরামর্শ করিয়া, ঔষধ দ্বারা স্বামীকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন কবির উক্তি এই,—"ঔষধ প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ। বুঢ়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ॥" উক্ত দুই ভণিতা হইতে যেমন তাঁহার দুই স্ত্রীর কথা অনুমান করা যায়, তেমনি উভয়ের মধ্যে যে বিবাদ-বিসংবাদ হইত এবং কাব্য লিখিবার সময় তিনি যে প্রৌঢ় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, ইহাও অনুমান করিতে পারি। কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, মাছ-মাংস ত্যাগ করিয়া, কবির অভিলাষে বহুকাল গোপালের উপাসনা করিয়াছিলেন।[৪] কবির স্বহস্তলিখিত পুথিতে নিম্নলিখিত অংশটি আছে।—

কবির পরিচয়

> কুলে শীলে নিরবন্ধ, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্যায় সজ্জনের স্থান।
> অতিশয় গুণ বাড়া, সুধন্য দক্ষিণপাড়া, সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥
> ধন্য ধন্য কলিকালে, রত্নাহু নদের কূলে, অবতার করিলা শঙ্কর।
> ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুন্যা করিলা ধাম, তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥
> বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব, দেউলা দিলা বুধদত্ত, কত কাল তথায় বিহার।
> কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া, বরদান করিলা সঞ্চার॥
> গঙ্গা সম সুনির্ম্মল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
> সেই ত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥
> হরিনন্দী ভাগ্যবান্, শিবে দিল ভূমি দান, মাধব ওঝা ধামাধিকারিণী।
> দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত, সেই পুরী হরের ধরণী॥

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

২ জানিজা নগরবাসী প্রভু রামাদিত্য। শিশুকাল হৈতে তার সেবা করি নিত্য।—ক, ক, চ।

৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ৪২৯ পৃঃ।

৪ কুয়াড়িকুলের জাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, এক ভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাজিয়া বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর, মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল।—ক, ক, চ।

Inf 4235 dt- 14/7/07

* * * কুলের আর, যশোমন্ত অধিকার, কল্পতরু নাগ উমাপতি।
অশেষ পুণ্যকন্দ, নাগঋষি সর্ব্বানন্দ, সেই পুরী সজ্জন-বসতি॥
কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটী, বেদান্ত নিগম পাটী, ঈশান পণ্ডিত মহাশয়।
ধন্য ধন্য পুরবাসী, বন্দ্য সে বাঙ্গালপাণী, লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়॥
কাঞ্জারী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার, শব্দকোষ কাব্যের নিদান।
কয়ড়ি কুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা, তস্য সুত উমাপতি নাম॥
তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধারণ পুরন্দর, নিত্যানন্দ সুরেশ্বর, বাসুদেব মহেশ সাগর॥
সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, এক ভাবে পূজিল শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুধন্য হৃদয় নাম, কবিচন্দ্র তার বংশধর॥
অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্।
শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান॥[১]

উপরে যে অংশ উদ্ধার করা হইল, তাহাতে মুকুন্দের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্রের ঊর্দ্ধতন আরও কয়েক পুরুষের নাম পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, উক্ত নামগুলি কবির বংশধরেরা শেষে পুথির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, ইহা ছাড়া মুকুন্দের কাব্য হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। তাঁহার বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং এই বংশীয়েরা দামুন্যা, বীরসিংহ ও হুগলী জেলার রাধাবল্লভপুর, এই তিন স্থানে বাস করিতেছেন।

মুকুন্দ যখন দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, সেই সময়ে পথে নৌকার মধ্যে গান রচনা করিবার জন্য চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। এই আদেশের তারিখ ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ। পুস্তকের শেষে তিনি ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা। সেই কালে দিলা গীত হরের বনিতা॥" কবির বয়স এই সময়ে পরিণত হইয়াছিল, অনুমান করা যায়; কেন না, পুস্তকের প্রথমে তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ ও জামাতার নামের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া পুস্তকের মধ্যেও "বুঢ়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ" এই ভণিতা দ্বারা তিনি যেন নিজেকে 'বৃদ্ধ' বলিয়াই ইঙ্গিত করিয়াছেন, মনে হয়। সুতরাং এই সময়ে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর অনুমান করিলে ১৪৫৪ শক বা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদের পর তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বলা চলে।

কবির সময়

কবি আড়রায় অবস্থান করিয়াই তাঁহার অমর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[২] ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি যখন পুস্তক রচনা শেষ

১ এই অংশ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত হইল।

২ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান করিল মুকুন্দ, সুখে থাকি আড়রা নগরে॥—ক, ক, চ।

করিয়া, তাহার ভূমিকা (গ্রন্থ উৎপত্তির বিবরণ) লিখিতেছিলেন, তখন মানসিংহ বঙ্গের শাসনকর্তা হইয়া আসিয়াছেন ;—অত্যাচার দূর হইয়াছে, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই গুণগ্রাহী কবি "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ, গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ" বলিয়া তাঁহাকে অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কয়েকখানি ছাপা পুস্তকের "সে মানসিংহের কালে" এই পাঠের পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় অক্ষয় বাবুর সম্পাদিত সংস্করণে "অধর্ম্মী রাজার কালে" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেও লিখিত হইয়াছে যে, কবির নিজের হাতের লেখা পুথিতেও শেষোক্ত পাঠই আছে। আমাদেরও তাহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। কেন না, মানসিংহের অধিকারকালে যদি কবির বর্ণিত অত্যাচার ঘটিত, তবে তিনি সেই অত্যাচারী শাসনকর্তাকে হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাইবেন, ইহা কখন সম্ভব নহে।

রাষ্ট্রবিপ্লব এবং রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারে বাধ্য হইয়া মুকুন্দ দেশত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশভক্ত কবির স্মৃতি হইতে দামুন্যার চিত্র একেবারে মুছিয়া যায় নাই; বরং প্রবাস-গত প্রেমিকের ন্যায়, তাঁহার নিকট উহা আরও মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। আড়রায় থাকিয়া তিনি যখন মানস নয়নে দামুন্যার চিত্র প্রত্যক্ষ করিতেন, তখন তাহার প্রতি পথ-ঘাট, পল্লী ও তরু-লতার স্মৃতি তাঁহার নিকট সজীব হইয়া উঠিত। রত্নাম্বু নদের সুনির্ম্মল জল, তাহার তীরের শিবমন্দির, সুকবি ও সুপণ্ডিতের নিবাস দামুন্যার দক্ষিণপাড়া, শিব-চরণে রত তথাকার সজ্জন-সমাজ, কবি অতি কাতর-হৃদয়ে এই সকলের বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ দামুন্যার প্রতি যে তাঁহার একটা গভীর মমতা ও ভক্তি ছিল, পূর্ব্বে যে রচনাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে আমরা ইহা জানিতে পারি।

কবির দেশভক্তি

মুকুন্দ যখন কাব্য রচনা করেন, রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার-কাহিনী তখনও তাঁহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। জমিদার ও তালুকদারগণের দুর্দ্দশা, সম্ভ্রান্ত লোকের অপমান, তখনও তাঁহার মনকে ব্যথিত করিতেছিল। তাই কাব্যের ভূমিকা ব্যতীত যদিও তিনি নিজের দুঃখকাহিনী আর কোথাও ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু ইহাঁদের দুর্দ্দশার বর্ণনা তিনি যেন নিজের অজ্ঞাতসারে কাব্যের মধ্যে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কালকেতুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, পশুগণ চণ্ডীর নিকট গিয়া কাতরতা জানাইতেছে। ভালুক বলিতেছে,—"বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নহি না রাখি তালুক॥" হস্তী—"বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর। লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর॥ কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি। আপনার দন্ত দুটা আপনার বৈরী॥......এত অপমান মাতা সহে কোন জন॥" বাঁদর—"নিবাসে নাহিক কাজ বীর সনে হঠ॥" বস্তুতঃ এক পৃষ্ঠাব্যাপী পশুগণের এই দুঃখ-কাহিনী পাঠ করিলে বোধ হয়, কবি যেন রাজকর্ম্মচারীর নিকট হিন্দুদের তখনকার দুর্দ্দশার কথাই পশুগণের উক্তির ছলে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ডিহিদারের অত্যাচার কবি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। তাই

অত্যাচারের স্মৃতি

কালকেতু যখন তাহার নগরে প্রজাপত্তন করিতেছে, তখন তাহাকে দিয়া তিনি প্রজাদের আশ্বাস দিতেছেন,—

"ডিগীদার নাহি দিব দেশে।"

চণ্ডীকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে মুকুন্দ কবির স্থান অতি উচ্চে। যদিও তাঁহার কাব্য মৌলিক নহে—প্রাচীন কবিগণের রচনা ও ভাব অবলম্বন করিয়া তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তথাপি ঘটনা-বৈচিত্র্য, আখ্যান-বস্তুর বর্ণনা, চরিত্রের বিকাশ এবং কাব্যাংশে তাঁহার গ্রন্থই প্রথম শ্রেণীর। প্রাচীন চণ্ডী-কাব্যের যে সকল চরিত্র অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল, মুকুন্দের কাব্যে তাহা বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল হইয়াছে। সমুদ্র হইতে যিনি মুক্তা আহরণ করেন, তাঁহার সাহস, চেষ্টা ও পরিশ্রম প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু যিনি সেই মুক্তাকে মাজিয়া ঘষিয়া, মালা প্রস্তুত করিয়া লোকসমাজে লইয়া আসেন, মানুষের নিকট তাঁহার কৃতিত্বই যেন বেশী বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে মুকুন্দ এই হিসাবে শ্রেষ্ঠ কবি।

কবির শ্রেষ্ঠত্ব

কিন্তু তাঁহার কাব্যের পুরুষ-চরিত্র তত উন্নত নহে। ধনপতির বিপদে উপেক্ষা এবং অগাধ শিবভক্তি থাকিলেও, তিনি উৎকৃষ্ট কাব্যের নায়কের গুণশালী নহেন। তাঁহার জীবনে কোন বৈচিত্র্য বা উদ্যমশীলতা নাই। স্নেহের দুলাল শ্রীমন্তের অল্প বয়সে সিংহল-যাত্রা, সাহস এবং পিতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বটে। কিন্তু ইহা ছাড়া তাহার চরিত্রে আর কি বিশেষত্ব আছে? মুকুন্দের হাতে কাব্যের বিকাশ ও পুষ্টি হইয়াছে, কিন্তু নায়ক-চরিত্রের কোন উন্নতি হয় নাই। এ বিষয়ে আমরা কবিকে দোষ দিতে পারি না। কেন না, যে অবস্থার মধ্যে কবির প্রতিভা স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পায়, তখনকার সমাজের অবস্থা সেরূপ ছিল না। আমরা বোধ হয়, তখনকার সমাজের পুরুষ-চিত্রই মুকুন্দের কাব্যে দেখিতেছি।

পুরুষ-চরিত্র অনুন্নত

কবিকঙ্কণের পুরুষে পৌরুষ নাই বটে, কিন্তু রমণী-চরিত্রে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। চণ্ডী-কাব্যে পৌরাণিক কোন আদর্শের অনুসরণ না থাকিলেও ফুল্লরা ও খুল্লনা যেন সীতা-সাবি-ত্রীরই অব্যক্ত ছায়া। এই দুই চরিত্রে কবি যে রমণীয়তা, কোমলতা, মাধুর্য্য, স্নেহ, পতিভক্তি এবং কষ্টসহিষ্ণুতা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা আজিও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দেখিতে পাই-তেছি। কবিকঙ্কণের কৃতিত্বই এইখানে। সুখ বা ঐশ্বর্য্য-বর্ণনায় তিনি সফলকাম হন নাই—দুঃখ-বর্ণনায়ই তিনি অদ্বিতীয়। ফুল্লরার "বারমাস্যা" পাঠ করিলে চোখের জল রাখা যায় না। কিন্তু সেই ফুল্লরা যখন রাজরাণী, তখন তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সম্ভ্রম আসে না। ইহা ছাড়া মুকুন্দের আর একটি গুণ আছে, যাহার নিকট তাঁহার অন্য সমস্ত গুণই পরাভূত হইয়াছে। সেটি হইতেছে—তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণনা। কবি স্বভাবের এতই পক্ষপাতী যে, তাঁহার কাব্যে অস্বাভাবিক বর্ণনা অতি কমই আছে। গুজরাটে কালকেতুর নগর পত্তনের সময় তিনি যে বিভিন্ন জাতির বর্ণনা

দুঃখ বর্ণনায় কৃতিত্ব

করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাহা কবি-কল্পনা নহে—ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গীয় মানব-সমাজের একটি নিখুঁৎ ফটো। প্রথমেই মুসলমানের বর্ণনা দেখুন,—

আইসে চড়িয়া তাজি, সৈয়দ মোগল কাজি, খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটী, বোলায় হাসনহাটি, এক সমুদায় গৃহ বাড়ী॥
ফজর সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটী, পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে, জপে পীর পেগম্বরে, পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে, অনুদিন কিতাব কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে, পীরের শীরিনি বাঁটে, সাঁঝে বাজে দগড় নিশাণি॥
বড়ই দানিসবন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ, প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ, বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥
না ছাড়ে আপন পথে, দশরেখা টুপি মাথে, ইজার পরয়ে দঢ় করি।
যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা, সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি॥
আপন টোপর লৈয়া, বসিলা গাঁয়ের মিয়া, ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাথ।
সুবলি নেহালি পানি, কুড়ানি বটুনি ছুনি, পাঠান বসিল নানা জাত॥
বসিল অনেক মিয়া, আপন তরফ লৈয়া, কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা, দান পায় সিকা সিকা, দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
করে ধরি খর ছুরি, কুকুড়া জবাই করি, দশ গণ্ডা পায় দান কড়ি।
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেই মাথা, দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥—ইত্যাদি।

বর্ণনার স্বাভাবিকতা

পূজারি ব্রাহ্মণের চিত্রটি দেখুন,—

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে, শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে, দেব পূজে ঘরে ঘরে, চাউলের বোচকা বান্ধে টান॥
ময়রা-ঘরে পায় খণ্ড, গোপঘরে দধিভাণ্ড, তেলি-ঘরে তৈলকুপী ভরি।
কোথাও মাসের কড়ি, কেহ দেয় দালি বড়ি, গ্রামযাজী আনন্দে সাতরি॥
গুজরাট নগরে, নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে, গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।
সাঙ্গ করি দ্বিজে কয়, কাহন দক্ষিণা হয়, হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ॥

বৈদ্য—

বৈদ্য জনের তত্ত্ব, গুপ্ত সেন দাস দত্ত, কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কার যশ, কেহ প্রয়োগের বশ, নানা তন্ত্র করয়ে বাখান॥
উঠিয়া প্রভাত কালে, ঊর্দ্ধ ফোটা করে ভালে, বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া জর্জ্জর ধুতি, কাঁখে করি নানা পুথি, গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥
কার দেখি সাধ্য রোগ, ঔষধ করয়ে যোগ, বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ, পলাইতে করে যোগ, নানা ছলে করয়ে বিদায়॥

কর্পূর পাঁচন করি, তবে জীয়াইতে পারি, কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয় বলে, কর্পূর আনিতে চলে, সেই পথে বৈদ্যের পয়ান ॥

তিনি মনুষ্য-সমাজকে এত গভীর ভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন যে, তাহার চিত্র কবির হৃদয়ে গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি ইতর জীবের বর্ণনায়ও মানবীয় উপমা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নীচের বর্ণনাটি দেখুন,—

মানবীয় উপমা

এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুসুমে।
যেন, এক ঘরে পেয়ে মান, গ্রামযাজী দ্বিজ যান, অন্য ঘর চলেন সম্ভ্রমে ॥

আকবরের পূর্ব্ব হইতেই ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে গোয়া নগরীতে পর্ত্তুগীজগণ অধিকার বিস্তার করিয়াছিল এবং মগদের সহিত মিলিত হইয়া ইহারা বঙ্গোপসাগরে দস্যুতা করিত। এই সকল ঘটনার ক্ষেত্র হইতে দূরে বাস করিয়াও মুকুন্দ, ইহার সংবাদ অবগত ছিলেন। ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রার সময় তাহাদের নৌকা "ফিরিঙ্গির দেশ"এর নিকট দিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের হারমাদা অর্থাৎ যুদ্ধ-জাহাজের ভয়ে দিনরাত্রি নৌকা বাহিয়া এই স্থান অতিক্রম করিয়াছিল, কবি এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, মুকুন্দের অভিজ্ঞতা কেবল দামুন্যা পল্লী বা আড়রা গ্রামেই নিবদ্ধ ছিল না। তখনকার দিনে আজকালকার মত সংবাদপত্র বা সংবাদ-প্রচারের অপর কোন সুবিধা না থাকিলেও, তিনি সেই সময়কার দেশের নানাবিধ অবস্থার সহিত পরিচিত ছিলেন—দেশ-বিদেশের কোন নূতন খবর প্রায়ই তাঁহার অবিদিত থাকিত না।

কবিকঙ্কণ যে এক জন উচ্চ দরের কবি ছিলেন, তাঁহার কাব্যের আরও একটি বিষয়ে তাহা আমরা জানিতে পারি। প্রতিভাশালী কবি, কাব্য লিখিবার সময়, তাহার চরিত্রগুলি ধ্যান করিতে করিতে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়েন—তাঁহার আর তখন বাহ্য জ্ঞান থাকে না। কাব্যোক্ত চরিত্রগুলি এই অবসরে কবির হাত ছাড়াইয়া, নিজেরাই তখন পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করে। উচ্চ শ্রেণীর কবির কাব্যে এইরূপে নাটকীয় ভাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও আমরা এইরূপ নাটকীয় ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। গঙ্গা এবং চণ্ডীর কোন্দলটি দেখুন,—

নাটকীয় ভাব

চণ্ডী—সাধিতে আপন কাম, আইলাম তোমার স্থান, বহিবে আমার কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে, চল গো আমার সঙ্গে, যাব রাজ্য কলিঙ্গ রাজার ॥
গঙ্গা, সন্তাপ করহ মোর দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ, হাজাবে কলিঙ্গ দেশ, তবে বৈসে গুজরাটপুর ॥

গঙ্গা—হই গো বিষ্ণুর দাসী, বিষ্ণু-পদ হইতে আসি, সেই প্রভু গতি সভাকার।
হই গো বিষ্ণুর অংশা, কারো নাহি করি হিংসা, কেন রাজ্য হাজাব রাজার ॥
দিদি, পর-পীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিয়া দুখ, হই আমি অশ্রুমুখ, তারে আমি সদয় হৃদয় ॥

চণ্ডী—কুম্ভীর মকরগণ, প্রাণী হিংসে অনুক্ষণ, কি কারণে ধর তারে কোলে।
মহাপাপ যার গায়, সে পাপী তোমাতে নায়, বৈষ্ণবী তোমারে কেবা বলে ॥
গঙ্গা, গরব না কর মোর আগে।
আসিয়া তোমার নীরে, বালীঘট করি মরে, সেই বধ তোমারে সে লাগে ॥
গঙ্গা—পূর্ব্বজন্মের ফলে, আসিয়া আমার জলে, প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায়।
মহিষ ছাগল মেষ, খায়্যা কৈলে অবশেষ, সেই বধ লাগিবে তোমায় ॥
তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা ॥
স্ত্রী হয়্যা করিলে রণ, বধিলে অসুরগণ, সমরে করিলে পান সুরা।
চণ্ডী—তোরে আমি ভাল জানি, পিয়াছিল জহ্নু মুনি, তোমার না কর্ম্মি জল পান।
কোন মড়া পোড়ে কূলে, কোন মড়া ভাসে জলে, শ্মশানে তোমার অধিষ্ঠান ॥
ইত্যাদি।

মাত্র এই এক জায়গায় নহে, মুকুন্দ তাঁহার কাব্যের বহু স্থলেই এইরূপ নাটকীয় ভাব দেখাইয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে এখানে আর বেশি তুলিতে পারিলাম না।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী যদিও ইতিহাস নহে,—কাব্যমাত্র, তথাপি অনুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যে সেই সময়কার এমন অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা ইতিহাসে মেলা কষ্টকর। বড় বড় বিষয় এবং রাজা-রাজড়ার ঘটনা লইয়াই ইতিহাস রচিত হইয়া থাকে; সাধারণ লোকের আচার-ব্যবহার, জীবন-যাত্রার প্রণালী, সমাজের অবস্থা, ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় আমাদের দেশের ইতিহাসে প্রায়ই আলোচিত হয় না—যদিও এই সকল বিষয় ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্গ। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী-শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে তাহার উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। মুকুন্দের কাব্য হইতে আমরা তখনকার সমাজের মোটামোটি এই কয়টি কথা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি,—তখনকার বড়লোকদের বাড়ীতে শিবমন্দির, অনাথমণ্ডপ, অতিথিশালা থাকিত; সহরের বড়লোকেরা "বাসাড়ে"দের জন্য ঘর তৈরী করিয়া দিতেন; বিদেশে যাহাদের ঘর-বাড়ী নাই, এমন প্রবাসী লোকেরা তথায় থাকিত।[১] ধনী লোকেরা যখন বিদেশ হইতে বাড়ী আসিতেন, তখন বাড়ীর কিছু দূরে থাকিয়াই নৌকা হইতে ভেরী বাজিয়া উঠিত; তাঁহাদের নৌকায় টিকারা প্রভৃতি আরও অনেক বাদ্য থাকিত; এই সকল বাদ্য বাজাইয়া তাঁহাদের গমনাগমনের সংবাদ ঘোষণা করা হইত।[২] বিলাসীরা কাণে সোনার অলঙ্কার পরিত, সারা গায়ে চন্দন মাখিত এবং মুখে

সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থা

১ ……চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে, অনাথমণ্ডপ অতিথিশালা।
বাসাড়ে জনের তরে, ধীবল মন্দির করে, প্রবাসী জনের তথি মেলা।—ক, ক, চ।

২ যখন পাইল সদাগরের ভেরীর সাড়া।—ক, ক, চ।

১ নগরে নাগর জনা, কানে লম্বমান সোনা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চ্চিত তনু, হেম দেখি যেন ভানু, তসর বসন পরিধান।—ক, ক, চ।

২ হাতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি।—ক, ক, চ।

৩ বিশাই কামিনা চণ্ডী করিল স্মরণ।—ঐ ঐ

৪ জোড়া জোড়া খাসি নিল বুঝারিয়া ভেড়া।—ক, ক, চ।

৫ মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান। সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥—ক, ক, চ।

৬ ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গা দরে এক পণ। ব্রাহ্মণ সজ্জনে কিনে করিতে তর্পণ॥—ক, ক, চ।

৭ পথে লাগ পাইল খণ্ডে, ফাঁস দিয়া মাইল কণ্ঠে, কিনা ছিল আমার ললাটে।—ক, ক, চ।

৮ নয় কাহন বাগ্দী উঠে যুদ্ধে তারা যম। সাত কাহন হাড়ি পাইক বার কাহন ডোম।—ক, ক, চ।

৯ মস্তকের পাগ দিল গায়ের পাছড়া।—ক, ক, চ।

১০ যখন পাকিবে খন্দ, পাড়িবে বিষম দ্বন্দ, দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।—ক, ক, চ।

১১ যত বেচ ভাল ধান, তার না লইব দান।—ক, ক, চ।

১২ কেহ আগাইয়া বীরে গুড় চাউলি মারে।—ক, ক, চ।

১৩ গমনের শুভবেলা, বাউরী যোগায় দোলা।—ক, ক, চ।

১৪ মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরুণিয়াগণ, আইসে তারা নানা দেশ হৈতে।—ক, ক, চ।

১৫ ঘোমুটা করিয়া পরে বার হাত সাড়ী।—ক, ক, চ।

১৬ কবরী বান্ধিল রামা নাম গুয়ামুটি। দর্পণে নিহালি দেখে যেন গুয়াগুটি॥—ক, ক, চ।

১৭ বাছিয়া পরয়ে মেঘডম্বর কাপড়।—ক, ক, চ।

গুআ ও হাতে পান লইয়া, তসরের কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।[১] কাহাকেও কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে, তাহাকে আজ্ঞাসূচক পান দেওয়া হইত।[২] কারিকরগণের নাম ছিল কামিনা। অনেকেই "যুঝারিয়া" ভেড়া পুষিত এবং তাহাদের লড়াই একটা উৎসবের জিনিষ ছিল।[৪] মাঘ, বৈশাখ প্রভৃতি পুণ্য-মাসে সম্পন্ন গৃহস্থেরা পুরাণপাঠ শুনিতেন।[৫] ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা তামা এবং রজত-শিপের ন্যায় গণ্ডারের খড়্গানির্ম্মিত শিপ বা কোষায় তর্পণ করিতেন। ঠগীজাতীয় খণ্ড নামে দস্যু ছিল; ইহারা পথিকের গলায় ফাঁস লাগাইয়া মারিয়া ফেলিত।[৭] জমীদারদের অধীনে বাগদী, হাড়ী এবং ডোমজাতীয় সৈন্য থাকিত এবং ইহারা যুদ্ধে খুব পটু ছিল।[৮] বাঙ্গালীরা পাগড়ী ধারণ করিত।[৯] ধান পাকিলে, দুষ্ট জমীদারেরা গরীব প্রজার সঙ্গে নানারূপ কলহ করিয়া তাহার শস্য হরণ করিত।[১০] ধান বিক্রয় করিবার সময় একরূপ দান দিতে হইত।[১১] বিবাহের সময় বর ও বরযাত্রীদের উপর গুড়-মাখা চাউল ফেলিয়া তামাসা করা হইত।[১২] বাউরীরা দোলা বহন করিত।[১৩] মজুরের নাম ছিল 'বেরুণিয়া'।[১৪] আজকাল পশ্চিমবঙ্গে মেয়েরা একবেড়া করিয়া কাপড় পরেন। কিন্তু কবিকঙ্কণের সময়ে এ অঞ্চলে মেয়েদের দোবেড়া (দোছুটী) কাপড় পরিবার রীতি ছিল।[১৫] মেয়েরা 'গুয়ামুটি' নামে একরকম খোঁপা বাঁধিতেন।[১৬] মেঘডম্বরু কাপড় এবং কাঁচলী, ধনী-স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করিতেন।[১৭] পাশা খেলা স্ত্রীলোকদের

মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল।[১] পিটালি ও হলুদ মাখিয়া গায়ের ময়লা পরিষ্কার করা হইত।[২] শঙ্খ পোড়াইয়া চুন হইত।[৩] মেয়েরা "কুলুপিয়া শঙ্খ" নামে শাঁখা পরিতেন; ইহা পরিতে কষ্ট হইত না—তালার মত চাবি খুলিয়া হাতে লাগান যাইত।[৪] লোকে সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে ধূপ-দীপ দিত।[৫] চণ্ডীর নিকট শূকর ও নরবলি দেওয়া হইত।[৬] বল্লালী কৌলিন্য-প্রথা নিন্দিত ছিল—অন্ততঃ মুকুন্দের নিকট। পাঠশালায় জনার্দ্দন ওঝার সহিত ঝগড়ার সময় শ্রীমন্ত বলিতেছে—"গোত্রে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেণ্যা। ব্রাহ্মণের মত নহি বল্লালসেন্যা॥" সন্তান জন্মিলে পর আঁতুড়-ঘরের দুয়ারে গরুর মাথা, জুতা ও জাল রাখা হইত।[৭] ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজার ন্যায় সাত দিনে সপ্তঋষির পূজা হইত।[৮] এই সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের খুব প্রসার ছিল। "দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত" এবং ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার অনুকরণে শ্রীমন্তের খেলার বর্ণনা দেখিয়া ইহা জানা যায়। ইহা ছাড়া শ্রীমন্তের আরও এই কয়েক রকম খেলার বর্ণনা আছে,—চিকা কড়ি, বিপঞ্চিকা, সটকা, বাগচাল, জুয়া, গাছে চড়িয়া ঝালি খেলা, পাশা খেলা। বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে এক ঝুড়ি সংস্কৃত বইয়ের নাম এবং "আচার বিনয় দীক্ষা, যতনে করাও শিক্ষা" ইহাও বর্ণিত আছে। ব্যাধ কালকেতুও ভাগবতের কথা বলিতেছে,—"এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে।" বিবাহের সময়, স্ত্রীআচারের কালে বরকে গরুর মাথার উপর দাঁড় করাইয়া রাখা নিয়ম ছিল।[৯] বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রীতে ঝগড়ার কথাও কবিকঙ্কণের-চণ্ডীতে লিখিত আছে। ডম্বুরু বাজনার বিশেষ প্রচলন ছিল।[১০] "শুক্র" অর্থে চন্দ্র ও চান্দ শব্দের ব্যবহার আমরা এত দিন সহজিয়া-সাহিত্যেই দেখিয়াছি। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ইহার প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, সাধারণের মধ্যে তখন এই অর্থ অজ্ঞাত ছিল না। লহনার ঔষধ-প্রসঙ্গে—"স্বামীর সম্ভোগ চান্দ রাখিবে যতনে। বাঘতেল সনে রামা মাখিবে বদনে॥" এক রকম হাতের শাঁখা ছিল—তাহার

---

১ চারি পাঁচ সখী মিলে রাত্রি দিবা পাশা খেলে।—ক, ক, চ।

২ পিটালী হরিদ্রা লয়্যা, খুল্লনারে বুলি চায়্যা, করিতে অঙ্গের মলা দূর।—ক, ক, চ।

৩ কর্পূর কিনিল শঙ্খচুন।—ক, ক, চ।

৪ দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।—ক, ক, চ।

৫ শ্রাদ্ধ করে কোন জন গঙ্গার সমীপে। সন্ধ্যাকালে কোন জন দেই ধূপ দীপে॥—ক, ক, চ।

৬ তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা। মোরে কিবা বলি দিয়া পূজিবে চণ্ডিকা।—ক, ক, চ।

৭ গোমুণ্ড দুয়ারে থাপিল ষষ্ঠী বুড়ী। দুয়ারে বান্ধিল জাল বেত্র উপানদ॥—ক, ক, চ।

৮ সপ্তম দিনে সপ্ত ঋষি করিল অর্চ্চনা। —ক, ক, চ।

৯ কাপাসের বাড়ী হইতে আনিল গোমুণ্ড। দাণ্ডাইয়া সাধু তায় রবে দুই দণ্ড॥
খুল্লনা করিবে যদি সাধুর অপমান। মৌনে রহিবে সাধু গো-মুণ্ড সমান॥—ক, ক, চ।

১০ চৌদিকে ডম্বরু বাজনা। ক, ক, চ।

নাম শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।[১] মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় পশুবলি ছাড়া, পূজক, নিজের অঙ্গ কাটিয়া রুধির বলি দিতেন। স্ত্রীলোকেরা রক্তবস্ত্র পরিয়া, মাথার চুল ছাড়িয়া দিয়া, মঙ্গল-বারে, অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে চণ্ডীর পূজা করিত এবং চণ্ডীর ঘট মাথায় করিয়া নাচিয়া বেড়াইত। ধনপতি, সিংহলের রাজাকে এই সকল জিনিষ দিয়া ভেট দিতেছেন,—এক শ পঞ্চাশখানি ভোট-কম্বল ও গড়া বাস, গঙ্গাজলী পাটি, ময়ূরের পাখার ছাতি—ইহার ডাঁটি লাল বর্ণের ও ঝালর মণিমুক্তায় রচিত। যুঝারিয়া ভেড়া, জিন সমেত ঘোড়া, শিকারী কুকুর, চামের ঠুলিতে চোক-বাঁধা সঞ্চান (বাজ) পাখী, খাঁচায় পোরা রাজহাঁস, ঘুঘু ও পায়রার ছানা, কৃষ্ণসার হরিণ, বাঘ ও সিংহ; খাসা চিনির লাড়ু, গঙ্গাজল ও পিণ্ড খেজুর। হাতে তাড়-বালা এবং কাণে সোনা-পরা শত শত লোক এই সব জিনিষ লইয়া চলিয়াছে। তাহাদের আগে-পাছে পাইকে পাহারা দিয়া যাইতেছে। রাজা ভেট অঙ্গীকার করিয়া, সদাগরকে এক শ কাহন কড়ি রন্ধনের 'ব্যাভার' এবং চন্দন ও অলঙ্কার দিলেন।[৪] শিশুর অলঙ্কার ছিল,—গলায় সোনার কাঁঠি, কোমরে সোনার শিকলি এবং পায়ে বাঁক-মল।[৫] লগ্নাচার্য্যেরা হাট-বাজারে পাঁজি শুনাইয়া ও কুশাই ওঝারা কাঁধে কুশের বোঝা লইয়া, বেদ-মন্ত্র পড়িয়া, লোকের নিকট হইতে কড়ি আদায় করিত।[৬] সখীস্থানীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে পরস্পর দেখা হইলে, মাথার উকুন বাছা একটা মস্ত কাজ ছিল। বিমলার মাতা ফুল্লরাকে বলিতেছে,—"আইস পরাণের সই বইস ভগিনী। মোর মাথার গোটা চারি দেখহ উকুনী॥" —ক, ক, চ। পল্লীগ্রামে এই প্রথা এখনও দেখা যায়। বৈশাখ ও মাঘ মাসে অনেকেই মাছ মাংস খাইতেন না।[৭] আজকালকার মত শীতবস্ত্রের প্রচলন তখন বেশী ছিল না। এক

---

১ কেমতে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ। অঙ্গের পুড়িয়া গেল পাটের বসন।...
সেই মত আছে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ। মলি নাহি পড়ে অঙ্গে পাটের বসন॥—ক, ক, চ।

২ সুবর্ণের বাটিতে দিল নিজ অঙ্গ বলি। সঘনে অভয়া বন্দ্যা দিল হুলাহুলী॥—ক, ক, চ।

৩ পরিয়া লোহিত বাস, আকুল কুন্তল পাশ, বেড়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
শিরে হেম ঝারি, নাচয়ে সুন্দরী, দিয়া জয় জয় ধ্বনি॥ ক, ক, চ।

৪ শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যাভার।...সাধুকে তুষিল রাজা ভূষণ চন্দনে॥—ক, ক, চ।

৫ বিচিত্র কপাল তটি, গলায় সুবর্ণ কাঁঠি, কটিতটে শোভে আর কনক শিকলি।
পদযুগে মল বাঁকি করে ঝলমলি।—ক, ক, চ।

৬ প্রবেশিতে হাট মাঝে, আসি হরি মহারাজে, ডাকে মীন রাশির কল্যাণ।
আশীষ তোমারে গর্জ্জি, আসিয়া শুনাল্য পঞ্জী, তারে দিলুঁ কাহনেক দান॥
কান্ধে কুশের বোঝা, নগরে কুশাই ওঝা, বেদ পড়ি করিল আশীষ।
ইচ্ছিয়া তোমার যশ, দিলুঁ তারে পণ দশ ... ...।—ক, ক, চ।

৭ বৈশাখ হল্য হিম গো বৈশাখ হল্য বিষ। মাংস নাহি খায় সর্ব্ব লোক নিরামিষ।
নিদারুণ মাঘ মাস নিদারুণ মাঘ মাস। সর্ব্বজন নিরামিষ করে উপবাস।—ক, ক, চ।

রকম তুলার জামা, "তুলিপাড়ি" ও "পাছুড়ি" নামক গায়ের কাপড় মধ্যবিত্ত লোকেরা গায়ে দিতেন, গরীব লোকেরা আগুন ও রৌদ্র পোহাইয়া, "খোসলা" নামক এক রকম কাপড় গায়ে দিয়া শীত কাটাইয়া দিত।[১] বর্ষাকালে গৃহস্থদের অন্নকষ্ট ও অর্থকষ্ট উপস্থিত হইত।[২] ধনী লোকেরা মাটির নীচে টাকা পুতিয়া রাখিত—"সর্ব্বধন সম্বরিয়া রাখিলেন খন্তে।"—ক,ক, চ। কায়স্থেরা হাট-বাজারে দোকানদারের বা বণিক্‌দের মুহুরির কাজ করিত—"বিচারিয়া কেহ দেখে, কাগজে কায়স্থ লেখে, সায় করি বেণে দেয় টাকা॥"—ক, ক, চ। অঙ্গভূষণের মধ্যে ফুল, প্রধান উপকরণরূপে গণ্য হইত এবং মালীরা পথে পথে ইহা ফিরি করিয়া বেড়াইত—"ফুলের পুটলি বান্ধে, সাজি করি ফিরে কান্ধে, ফিরে তারা নগরে নগর॥"—ক, ক, চ। জুতা বা পাদুকার প্রচলন তখন বেশী ছিল না। বাড়ীতে অভ্যাগত আসিলে, তাঁহাকে পা ধুইবার জন্য জল দেওয়া হইত। ধনপতি যখন শ্বশুরবাড়ী গিয়াছেন, তখনও তাঁহার পায়ে জুতা নাই--জল আনিয়া তাঁহার পা ধোয়াইয়া দেওয়া হইতেছে।—"কেহ জল দেই কেহ চরণ পাখালে॥"—ক, ক, চ। তবে বোধ হয়, বড়লোকেরা শুইবার আগে, পা ধুইয়া, পাদুকা ধারণ করিতেন। ধনপতি—"চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন॥"—ক, ক, চ। গাড়ুতে করিয়া ঘি পরিবেষণ করিবার রীতি ছিল,—"সুবর্ণের গাড়ুতে লহনা দেই ঘি॥"—ক, ক, চ। বণিকেরা গন্ধেশ্বরীর অর্চ্চনা করিত—"বলে সাধু লক্ষপতি, দিল গন্ধেশ্বরীর দোহাই॥"—ক, ক, চ। সুশীলা শ্রীমন্তকে "সাঙলী" গামছার লোভ দেখাইতেছে,—"সাঙলী গামছা দিব ভূষিত কস্তূরী॥"—ক, ক, চ। ইহা ছাড়া গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতির বর্ণনা-প্রসঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে সে সকল কথা এখানে বলিলাম না।

৫। দ্বিজ জনার্দ্দন

দ্বিজ জনার্দ্দনের রচিত চণ্ডীকাব্যকে আমরা মুকুন্দের অনেক পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করি। তাই কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পরেই তাহার উল্লেখ করিলাম। এই কাব্যখানি অতিশয় ছোট—ঠিক যেন একটি ব্রতকথা। ইহা হইতে কবির পরিচয় প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। রচনার নমুনা পরপৃষ্ঠায় কিছু তুলিয়া দিলাম।

---

১ পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন। তুলিপাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ॥
তৈল তুলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপন। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা॥—ক, ক, চ।

২ আষাঢ় পুরিল মহী নবমেঘে জল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥—ক, ক, চ।

১ম ভাগ

নিত্য নিত্য সেই ব্যাধ আনন্দিত হইয়া। পরিবার পালে সে যে মৃগাদি মারিয়া॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ লগুড় কাঁধেতে। সর্ব্ব মৃগ ধাইয়া গেল বিন্ধ্য গিরিতে॥
ব্যাধ দেখি মৃগ পলাইল ত্রাসে। পাছে ধাএ ব্যাধ মৃগ মারিবার আশে॥
বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ। মঙ্গলচণ্ডীর পদে লইল শরণ॥
ব্যাধেরে দেখিয়া দেবী উপায় চিন্তিল। দুর্গতিনাশিনী দেবী সদয় হইল॥
সুবর্ণ গোধিকারূপ ধরিয়া পার্ব্বতী। ব্যাধ-পথ যুড়িয়া রহিল ভগবতী॥
মৃগ না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত। সুবর্ণ-গোধিকা পথে দেখে আচম্বিত॥
সুবর্ণ-গোধিকা পাইয়া হরষিত মনে। ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥
মনে মনে ভাবি ব্যাধ ধীরে ধীরে হাটে। সত্বরগমনে গেল বাড়ীর নিকটে॥
হরষিত মনে ব্যাধ গদ গদ বাণী। উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিনী॥
যেন মতে গৃহে নিয়া থুইল গোধিকা। পরম সুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা॥
দিব্যরূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু। গৃহিণীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু॥
মঙ্গলচণ্ডিকা বোলে শুন ব্যাধবর। তুষ্ট হয়ে দেখা দিল তোমার গোচর॥
সংপ্রতি হইল ব্যাধ তোমার শুভযোগ। পঞ্চ শত স্বর্ণাঙ্গুরী কর উপভোগ॥
আজু হোতে ব্যাধ তুমি না যাইবা বন। মৃগ না মারিবা এহি শুনহ বচন॥ ইত্যাদি

২য় ভাগ

অনুগত জনে দয়া করে গিরিসুতা। চলহ খুল্লনা গৃহে সাধুর দুহিতা॥
ব্রতের বিধান সর্ব্ব ব্রতীএ কহিল। প্রণাম করিয়া তবে খুল্লনা চলিল॥
হারাইয়াছিল ছাগল পথে পাইল তারে। গৃহে আসি খুল্লনা যে বিবিধ প্রকারে॥
চণ্ডিকার পূজা করে ভক্তি অনুসারে॥ ... ...
মঙ্গলচণ্ডীর বরে বাড়িল উন্নতি। ব্রত হতে সুখী হৈল খুল্লনা যুবতী॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাধুএ তুষিল। কত কাল পরে কন্যা গর্ভবতী হৈল॥
খুল্লনার গর্ভ ছয় মাস হৈল যবে। বাণিজ্যেরে চলে ধনপতি সাধু তবে॥
স্বামীর অগ্রেত গিয়া করিল ভকতি। বাণিজ্য করিতে সাধু হইলেক মতি॥
ছয় মাস গর্ভ মোর জানাইল তোমারে। জানিবার পত্রে হর্ষে দিলেক কুমারে॥
হীরা মণি মাণিক্য আর নানা দ্রব্য যতে। হরষিত ভরে ডিঙ্গা যত লয় চিতে॥
ডিঙ্গাতে অর্থ ভরি সাধুর নন্দনে। খুল্লনা আসিতে আজ্ঞা করিল তখনে॥
মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে কারণ। অর্ঘ্য আনিতে বিলম্ব হইল তখন॥
বিলম্ব দেখিয়া তবে সাধু মহাজন। চণ্ডিকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন॥[১] ইত্যাদি

---

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত।

৬। ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকে আমরা চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে গ্রহণ করিলাম বটে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে চণ্ডীমঙ্গল না বলিয়া, অন্নপূর্ণা-মঙ্গল বলাই উচিত। কেন না, ইহার মধ্যে মুখ্যভাবে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে। সুন্দরের সিঁদ কাটিবার সময় কালীপূজার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু চণ্ডীর প্রসঙ্গ ইহার মধ্যে মোটেই নাই। চণ্ডী ও অন্নপূর্ণা, মূলে এক শক্তি হইলেও, উভয়ের রূপে পার্থক্য আছে। চণ্ডী অপেক্ষা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিও আধুনিক। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণামূর্ত্তি এবং তাঁহার পূজা প্রচার করেন। "সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা। প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্ত মহিমা।" ভারতচন্দ্রের এই কথা হইতে ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। চণ্ডীকাব্যের উপাখ্যানও অন্নদামঙ্গলে গৃহীত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে ইহাতে হরিহোড় এবং ভবানন্দের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধীয় এই প্রবন্ধের মধ্যে অন্নদামঙ্গলের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া, সংক্ষেপে পরিচয় মাত্র প্রদান করিব—যদিও ইহাতে আলোচনার জিনিষ যথেষ্টই আছে।

অন্নদামঙ্গল তিন অংশে বিভক্ত ;—প্রথম অংশে দেবদেবীর বন্দনা, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন, দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ, শিবের বিবাহ, কন্দল ও ভিক্ষাযাত্রা, অন্নপূর্ণারূপে শিবকে অন্নদান, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক কাশীতে অন্নপূর্ণার পুরী নির্ম্মাণ, ব্যাস ও শিবের কলহ, হরিহোড় এবং ভবানন্দের উপাখ্যান। দ্বিতীয় অংশে বিদ্যাসুন্দর। তৃতীয় অংশে মানসিংহ ও প্রতাপ আদিত্যের যুদ্ধ, ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা, বন্ধন এবং দিল্লীতে ভূতের উৎপাত, ভবানন্দের মুক্তি ও স্বদেশযাত্রা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অপরাপর চণ্ডীমঙ্গলের সহিত তুলনা করিলে আমাদের মনে হয়, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল একখানি অতি নিম্নশ্রেণীর কাব্য। ইহাতে কি দেবতা, কি মনুষ্য, কোন চরিত্রই উন্নতি লাভ করে নাই ;—উন্নতি ত দূরের কথা, ইহারা কবির বিকৃত রুচি ও অশ্লীল ভাবে একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে। অন্নদামঙ্গলের সহিত বিদ্যাসুন্দরের পালা যোজনা করিয়া ভারতচন্দ্র, অন্নদার আসন অনেকটা নীচে নামাইয়া দিয়াছেন। ভারতের পূর্ব্বে কোনও দেবীভক্ত, উপাস্য দেবতাকে এতটা নীচু করিয়া গড়িয়াছেন কি না, জানি না। তিনি দেবমূর্ত্তি গড়িতে গিয়া, বিকৃত রুচির প্রলেপে তাহাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। বেলপাতার সহিত কাঁটা সংযুক্ত ছিল বলিয়া ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর অভিশপ্ত হইয়াছেন ; ভারতের অন্নদামঙ্গলে কুবেরের পুত্র নলকূবর এবং অনুচর বসুন্ধর কামক্রীড়ায় আশক্ত বলিয়া অন্নপূর্ণা তাহাদিগকে শাপ দিতেছেন। দেবপুত্র নীলাম্বরের চরিত্র নির্ম্মল। বসুন্ধর এবং নলকূবরের চরিত্র কাম-কলুষিত—যেন মুসলমানী আমলের বিলাসী মদান্ধ যুবক। ভারত শিবভক্ত,—কিন্তু তিনি শিবকে যেরূপ আঁকিয়াছেন, তাহা ভক্তের উপযুক্ত হয় নাই। ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ—যিনি ভক্তি ও বৈরাগ্যে দেবতারও আদর্শ, ভারতের হাতে তিনি ঢেঁকীর উপর চড়িয়া—"নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে।" মেনকা, বঙ্গীয় কুলবধুগণের আদর্শ এবং

তাঁহার উমা-বাৎসল্যের কথা শুনিয়া আজও বাঙ্গালীর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়ে। ভারতের হাতে তিনি ধূমাবতীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং লাজ-ভয় ত্যাগ করিয়া, হাতনাড়া দিয়া, উচ্চ গলায় ডাক ছাড়িয়া নারদকে গালাগালি করিতেছেন। বস্তুতঃ অন্নদামঙ্গলের দেব-চরিত্রে স্বর্গীয় ভাব ত একেবারেই নাই—বাঙ্গালার মানব-চরিত্রের যে কোমলতা, তাহাও ইহাতে পরিস্ফুট হয় নাই। ভারতের রচনাও ভাব-সম্পদে সম্পন্ন নহে। তাঁহার কাব্যখানি আগাগোড়া পাঠ করিলে, পাঠক কোথাও এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিবার অবকাশ পাইবেন না। কাব্যোক্ত চরিত্রের দুঃখ কিংবা সুখাতিশয্যে পাঠকের হৃদয় অভিভূত বা আনন্দিত হইবে না। এই সকল চরিত্র যেন নির্জীব প্রতিমামাত্র—ভারতের কবিত্বশক্তি উহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যের আর একটি দোষ উপমা-বাহুল্য। বিদ্যার রূপ-বর্ণনাটি দেখুন,—

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কি ছার মিছার কামধেনু রাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥ ইত্যাদি।

বাহুল্য-ভয়ে সমস্তটা তুলিতে পারিলাম না। আমরা বর্ণনাটি পড়িয়া, ইহাতে ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ছাড়া বিদ্যার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই নাই। উপমা দিয়া তিনি যে জিনিষকে পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, উপমার বাহুল্যে তাহা যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। সেই ঢাকনি সরাইয়া প্রকৃত জিনিষটিকে দেখিতে পাঠকের অনেকটা আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এ সমস্তই ভারতচন্দ্রের দোষ; কেবল তাঁহার একমাত্র অসাধারণ গুণ—ভাষার চমৎকারিত্ব। তিনি ভাব-দরিদ্র বটে, কিন্তু ভাষা-দরিদ্র নহেন। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে ইঁহার মত ভাষার ঐশ্বর্য্য আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। ভাবের অভাব তিনি ভাষার দ্বারা পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।—ভাবহীন হইয়াও ভাষার জন্য অন্নদামঙ্গল লোকের চিত্ত অধিকার করিয়াছে—বিশেষতঃ আদিরসের বর্ণনা বেশী আছে বলিয়া নৈতিক চরিত্রহীন যুবকগণের নিকটে আদর পায়।

৭। লালা জয়নারায়ণ সেন

ভারতচন্দ্রের পর লালা জয়নারায়ণ সেন একখানি চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন। এই বইখানি পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং এই প্রবন্ধে ইহার উল্লেখমাত্র ব্যতীত এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে পারিলাম না। বইখানি এ পর্য্যন্ত ছাপা হয় নাই। ইহার মাত্র একখানি পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হইয়াছে এবং সে পুথিখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি।

৮। মুক্তারাম সেন

চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রামনিবাসী মুক্তারাম সেনের রচিত আর একখানি ছোট চণ্ডীকাব্য আছে। ইহার নাম "সারদামঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী"। গ্রন্থমধ্যে কবি নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই,—

মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী। সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী॥
ধার্ম্মিক শরীর দানে অকাতর নাম। তেন মত প্রতিজৈষ্ঠ (?) লালা নন্দরাম॥

চাটিগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম নিজ গ্রাম। বন্দহু জনমভুমি দেবগ্রাম নাম ॥
আদ্য গোত্র আদ্য সেন ভেষজে বিশ্রাম। বসতি জাহ্নবীকূলে রাঢ়া হেন নাম ॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর। বেদের উদ্ভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর ॥
আদ্য অত্রি অর্জ্জুন গার্গব বার্হস্পত্য। স্বকীয় বিদ্যাতে পরউপকারী চিত্ত ॥
তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া। বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিআ ॥
সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব। তান পুত্র নিধিরাম স্বাগত পারগ ॥
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি। তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি।
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম। সদাএ ভবানীপদে মানস বিশ্রাম ॥
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজকুলমণি। তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃমূর্ত্তী আমার জননী ॥
পতি সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস। তদবধি চিত্তে মোর সদাএ উল্লাস ॥

মুক্তারাম চিরকুমার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে অবস্থান করিতেন। কথিত আছে, ইনি আদ্যা শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

সারদামঙ্গল কাব্যখানি অতিশয় ছোট এবং ইহাতে কবির কবিত্বশক্তিও তত প্রশংসনীয় নহে। তবে মোটের উপর নিবিষ্টমনে পাঠ করিলে বইখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবির একটা তন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়। হয় ত ইনি কবিত্ব-শক্তিতে তত উচ্চ ছিলেন না; কিন্তু যে ভাবের প্রেরণায় তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার সে ভাবের খুব গভীরতা ছিল। মোটের উপর কাব্যখানি ভাবহীন বা একেবারে নীরস নহে। কবি শক্তির উপাসক। কাব্যের মধ্যে তিনি যে সব ধুয়া ব্যবহার করিয়াছেন, রচনা হিসাবে তাহা উৎকৃষ্ট না হইলেও, ইহাতে তাঁহার প্রাণের কামনা দেবীর নিকট সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে।

আজু শুভ দিন রে ভবানী কর ভাবনা।
জাবত না ঘটে রে বিষম যমযন্ত্রণা ॥
ভবানী ভাবিতে মন না করহ ছলনা।
করম-গঠিত দেহ নহি জান আপনা ॥
ভবানী-চরণ-ধাম করহ কামনা।
শমন তরিয়া হইবা পারি সাত যোজনা ॥
মন রসে প্রেমবশে যে করে ভাবনা।
সে জনের তুলনা দিতে মুক্তরামে জানে না ॥

ইত্যাদি গানে কবির গভীর দেবী-ভক্তি এবং সংসার-বৈরাগ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, কবি মুক্তারাম যশস্বী হইবার আশায় কাব্য লেখেন নাই। তিনি যে ইষ্ট-দেবীকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন এবং ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিতেন, তাঁহারই মাহাত্ম্যপ্রকাশক বই লিখিয়া তিনি কতকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিলেন

কাব্যের মধ্যে দুই জায়গায় কবি গ্রন্থ-রচনার তারিখ দিয়াছেন। তাহা এই,—

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি। মুক্তারাম সেন ভণে ভাবিয়া ভবানী ॥

গ্রহ—৯, ঋতু—৬, কাল—১, * শশী—১ অর্থাৎ ১১৬৯ শক। কবি আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে মহাসিংহ নামক দেশ-অধিকারীর কথা বলিয়াছেন—সম্ভবতঃ ইহাঁরই শাসন-সময়ে তিনি কাব্য লিখিয়া থাকিবেন। মহাসিংহ মোগল আমলে ১৭৫৪—১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ আজ হইতে ১৬০ বছর পূর্ব্ববর্ত্তী; কাব্যের রচনা-কাল ১১৬৯ শকাব্দ হইলে তাহা ৬৭১ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায়, কবি তখন মহাসিংহের নাম উল্লেখ করিতে পারেন না। সুতরাং আমার বোধ হয়, ১১৬৯ শকাব্দ নহে—উহা বঙ্গাব্দ। ১১৬৯ বঙ্গাব্দ ধরিলে তাহা ১৫৬ বছর পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। পুরাণ পুথির মধ্যে বঙ্গাব্দকে শকাব্দ বলিয়া অনেক স্থলে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

কবির মধ্যম ভ্রাতা ব্রজলাল সেন একজন সাধক পুরুষ ছিলেন এবং তিনিও একখানি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

৯। ভবানীশঙ্কর দাস

মুক্তারাম সেনের পর ১৭০১ শকাব্দে চট্টগ্রামবাসী আর একজন কবি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন—ইহাঁর নাম ভবানীশঙ্কর দাস। এই কাব্যখানি আকারে বড়, তবে কবিকঙ্কণচণ্ডী অপেক্ষা কিছু ছোট এবং ইহার নাম "মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা"। কাব্যের মধ্যে কবি নিজের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই,—

মোর আদিপুরুষ জন্মিল রাঢ়াগ্রাম। আত্রেয় গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম ॥
মহাভাগ্যবন্ত কায়স্থ ছিলেন নরদাস। রাঢ়া ভোমে বদিখি প্রদেশেতে নিবাস ॥
নিত্য নিত্য অর্চ্চিলেক জাহ্নবীর পাএ। তান বরে সিদ্ধিশিলা পাইল তথাএ ॥
শীলার প্রসাদে সেই হৈল বড় ধনী। দান ধর্ম্ম করি সুখে বাঞ্চল অবনী ॥
তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ হৃদানন্দ। পূর্ব্বদিকে ব্রজ কৈল হইয়া আনন্দ ॥
নিরান্নের (?) নিয়ম জে না জায় খণ্ডান। চাটিগ্রামে আসিলেক ত্যাগি সেই স্থান ॥
চাটিগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে। তথা গিয়া নিজ পুরী কৈলানন্দমনে ॥
কৃষ্ণানন্দের সন্তান জন্মিল বিষ্ণুদাস। মহানন্দে সেই সাধু করিল নিবাস ॥
তান পুত্র নারায়ণ বঞ্চে নানা রঙ্গে। কুলপুরোহিত রামচন্দ্র লৈয়া সঙ্গে ॥
তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন। মোর পিতৃপিতামহ সেই মহাজন ॥
নিজ কুলধর্ম্মে রত আছিল বিশেষ। দৈব হেতু কিন্তু তথা পাইলেন্ত ক্লেশ ॥
গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি। নিবাস করিলেন সুখে চক্রশালা পুরী ॥

* সাধারণতঃ কাল শব্দ ৩ সংখ্যাবাচক হইলেও, অনাদিনিধন মহাকালকে বুঝাইতে ১ সংখ্যাও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কাল শব্দের ৬ মান ধরিয়া কাব্যের রচনা-কাল ১৬৬৯ শকাব্দ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাল শব্দের ৬ সংখ্যাবাচক অর্থ আমরা কোথাও পাই নাই।

১ কটন সাহেবের চট্টগ্রামের রেভিনিউ হিষ্ট্রী।

তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম শ্রীয়মন্ত। মহাসুখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত॥
শ্রীযুত নয়ন রায় তাহান তনএ। আহ্মার জনক সেই মহাশএ॥
কুলধর্ম্মে রত পূত ছিল অনুক্ষণ। শঙ্কর আহ্মার নাম তাহান নন্দন॥

১৭০১ শকাব্দে ভবানীশঙ্কর তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এই তারিখ গ্রন্থমধ্যে আছে,—ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে। ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে॥

কথিত আছে, কবি তাঁহার বাড়ীর সাম্‌নের দীঘির মধ্যে টঙ্গী প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অবস্থানপূর্ব্বক শুচি ও সংযতভাবে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় তাঁহার বাড়ীতে এই কাব্যখানি সুরলয়-যোগে গান করা হইত।

মাধবাচার্য্যের জাগরণকে আদর্শ এবং অবলম্বন করিয়া ভবানীশঙ্কর তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন। শুধু অবলম্বন নহে, উক্ত জাগরণ হইতে তিনি অনেক বিষয় অবিকল উদ্ধৃতও করিয়াছেন। কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য হজম করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। বাঙ্গালা ভাষায় কিছু লিখিতে হইলেই, তাহার উপর সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য ফলান এই সময়কার কবিগণের একটা ঝোঁক ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্র যেমন নিপুণ ভাবে বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের মিলন ঘটাইয়াছেন, অপর কোন কবি সেরূপ পারেন নাই। ভবানীশঙ্কর সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন—বড় বড় আভিধানিক শব্দ তাঁহার মুখস্থ ছিল, কিন্তু কাব্যে তিনি ইহার সুব্যবহার করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা, বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা রামপ্রসাদেরও উপরে। ভবানীশঙ্করের কবিত্ব-শক্তি যে একেবারেই ছিল না, তাহা নহে; অস্বাভাবিক সংস্কৃত শব্দের মায়া কাটাইয়া তিনি যেখানে খাঁটি বাঙ্গালায় কোনও বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই একটু সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু গোটা বইখানির মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই কম। তাঁহার সংস্কৃতবহুল রচনার নমুনা দেখুন,—

অম্বে পঙ্করুহাঙ্‌ঘ্রিতে করম নিবাস। তবাষ্টার্চ্চা পদবন্ধে রচিবারে চাহি।
গব্যার্ণবোদ্ভবা দেবী বন্দম একমনে। দুর্গানামাক্ষরদ্বয় জপে জেই প্রাণী।
অঙ্গেরাজ্য ভঙ্গ হএ আগমের বাণী॥ ধব-বাচে দুঃখিত হইল সোমবক্ত্রা।
তূর্ণব্রজে গেল রামা সখীর গৃহদ্বারে। এবে শুনি বদ বাচ না কর বিলম্ব।

সংস্কৃত শব্দের এইরূপ বিকৃত উদ্‌গারের গন্ধে পাঠকের নিকট বইখানি আগাগোড়া অপাঠ্য হইয়া রহিয়াছে। কবির সময়ে হয় ত এই সকল রচনা খুবই প্রশংসার ছিল, কিন্তু আজকালকার সমালোচকদের নিকট ইহার কোনই মূল্য নাই। অবশ্য সংস্কৃতবহুল বাঙ্গালা রচনামাত্রেরই আমরা নিন্দা করিতেছি না। স্ত্রীকবি আনন্দময়ীর রচিত নীচের অংশটি দেখুন,—

হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে পরোক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়রূপা ও রূপে মজন্তি। হসন্তি স্খলন্তি দ্রবন্তি পতন্তি॥
কত চারুবক্ত্রা সুবেশা সুকেশা। সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥
কত ক্ষীণমধ্যা শুভাঙ্গা সুযোগ্যা। রতিজ্ঞা বশীজ্ঞা মনোজ্ঞা মদজ্ঞা॥ — হরিলীলা।

বাঙ্গালার মধ্যে ইহা একরূপ খাঁটি সংস্কৃত রচনা হইলেও পড়িতে আমোদ এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে—বাক্যের সমন্বয় আছে। ভবানীশঙ্কর সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দের সমন্বয় সাধন এবং স্থান বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার কাব্য সুপাঠ্য নহে।

মঙ্গলচণ্ডীর যে কয়খানি বিশিষ্ট কাব্য, আমরা তাহার আলোচনা করিলাম। কাব্যাকারে রচিত মঙ্গলচণ্ডীর এই সকল বড় বড় গীত আট দিন ধরিয়া গান করা হইত—দিনে একটি এবং রাত্রে একটি, আট দিনে এইরূপে ষোলটি পালা থাকিত। আট দিনে গান করা হইত বলিয়া এই গানের নাম অষ্টমঙ্গলা। আবার মঙ্গলচণ্ডীর আর একটি নামও অষ্টমঙ্গলা। ইন্দ্র, কলিঙ্গরাজ, কালকেতু, খুল্লনা, শ্রীমন্ত, শালবাণ, বিক্রমকেশরী ও ধনপতি—এই আট জন ভক্তের সাহায্যে দেবীর পূজা এবং মঙ্গল-গান সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল বড় বড় চণ্ডীকাব্য হিন্দুর ঘরে আমোদ উৎসবে—বিবাহ, উপনয়ন ও দুর্গাপূজায় গান করা হইত। রাজা-মহারাজা, জমীদার ও সম্পন্ন লোকেরা ইহাতে উৎসাহ দিতেন—ভাবুক লোকেরা গান শুনিয়া চখের জল ফেলিতেন —সাধারণের মধ্যে একটা ধর্ম্মভাব বহিয়া যাইত। ইহা ছাড়া আর এক রকম চণ্ডীমঙ্গল আছে, তাহা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা, ছড়া বা পাঁচালী। ইহা সংখ্যায় এতই বেশী যে, গণিয়া শেষ করা যায় না। মঙ্গলচণ্ডী বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনে কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহা সহজে বুঝা যায়। লোকের মুখে মুখে যে সকল পাঁচালী বা ব্রতকথা প্রচলিত আছে, এখানে সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, আমরা এই সম্বন্ধীয় যে কয়খানি পুথির সন্ধান পাইয়াছি, এখানে তাহার তালিকা দিতেছি।

১। **চৈত্রমাহাত্ম্য**—ইহা একখানি ছোট চণ্ডীকাব্য; মোট ১৩ পৃষ্ঠা লেখা এবং ইহাতে লহনা-খুল্লনার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যে ভণিতা নাই, সুতরাং রচয়িতার নামও জানা যায় না। প্রথমেই আছে,—

জার নাম স্মরণে দারিদ্র্য দুঃখ জাএ।　　মহা পদ পাএ সেই ঈষত লীলাএ॥
তাহান চরিত্র রচিবারে করি আশা।　　লোক পরিতোষেরে করিব দেশী ভাষা॥

২। **অষ্টমঙ্গলার গুণকথন**—চট্টগ্রাম, পরৈকোড়ানিবাসী রসিকচন্দ্র দাস-বিরচিত। ইহাতে শিব কর্তৃক অষ্টমঙ্গলার দয়া, সুশীলতা প্রভৃতি গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

৩। **চৌতিশা**—রচয়িতার নাম নাই—কবিকঙ্কণ উপাধিমাত্র আছে। বিষয়—চৌত্রিশ অক্ষরে চণ্ডীর স্তব। রচনার তারিখ—"চাপ ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত। পঞ্চবিংশে মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত॥"

৪। **কালকেতুর চৌতিশা**—চৌত্রিশ অক্ষরে বিরচিত মঙ্গলচণ্ডীর স্তব। রচয়িতা শ্রীচান্দ দাস। ভণিতা এই,—

ক্ষেমঙ্করী খড়্গ ধরি, ক্ষয় কৈলা যত অরি, ক্ষম দোষ অভয়া পার্ব্বতী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রণমিঞা, ক্ষিতিতলে লোটাইয়া, শ্রীচান্দ দাসের কাকুতি॥

৫। **শ্রীমন্তের চৌতিশা**—রচয়িতার নাম দেবীদাস সেন। যথা—"ক্ষয় করি রিপু-সৈন্য খণ্ডাও আপদ। ক্ষীণ দেবীদাস সেনে মাগে মুক্তিপদ॥"

৬। **কালকাষ্টক**—চণ্ডীর স্তব। রচয়িতার নাম শম্ভু। যথা—"শম্ভু কহে হেন লয় দেখি হরঘরিণী। বন্দম শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজ-নন্দিনী॥"

৭। **জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালা**—রচয়িতার নাম নাই—মাত্র ৭২টি পয়ার আছে। পুথির তারিখ ১১৯৩ সন। "জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী যেবা শুনে। সর্ব্বসিদ্ধি হএ তার চণ্ডিকা কারণে॥"

৮। **নিত্যমঙ্গলচণ্ডিকার পাঞ্চালী**—মোট ১২টি পাতা। ভণিতা এইরূপ—"ব্রতীগণ ভাগ্যবতী কি কৈমু কথন। চণ্ডীদাস দেয় কহে শিবনারায়ণ॥"

৯। **নিয়তমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী**—রচয়িতার নাম দ্বিজ রঘুনাথ। ভণিতা এই—"নিয়তমঙ্গলচণ্ডী বন্দিয়া যে মাথে। পাঞ্চালী রচিয়া কহে দ্বিজ রঘুনাথে॥"

১০। **নিয়তমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী**—বাণীরাম ঠাকুর-রচিত। ইহার দুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে।

১১। **নিকট-মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী**—রচয়িতার নাম দ্বিজ রঘুনাথ।

১২। **জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা**—দ্বিজ গদাধর কবিচন্দ্র-বিরচিত।

১৩। **জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী**—রচয়িতার নাম নাই।

১৪। **মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালা**—রচয়িতার নাম—শ্রীমদন দত্ত। চৈত্রমাহাত্ম্যের রচয়িতার মত ইনিও বলিতেছেন,—"লোক পরিতোষেরে কহিমু দেশী ভাষা॥"

১৫। **মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালা**—দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র-বিরচিত। ইহা একখানি ছোট-খাট চণ্ডীকাব্যের মত; ৩ পাতায় শেষ। ধনপতি ও লহনা-খুল্লনার উপাখ্যান আছে। ভণিতা—

"দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র ভণে চণ্ডীর চরণ। মঙ্গলচণ্ডীর গীত কৈল সমাপন॥"

১৬। **সঙ্কটমঙ্গলচণ্ডিকা-ব্রতকথা**—রচয়িতার নাম নাই।

১৭। **সুবচনার পাঞ্চালা**[১]—দুঃখী দ্বিজ-বিরচিত। ভণিতা এই—"নৃপতি যে হরিদাস, সবংশে হউক নাশ, মোর পুত্র বন্দী কৈল কেনি। কহে দুঃখী দ্বিজবরে, বন্দম মাতা জোড় করে, উদ্ধার করহ সুবচনী॥"

১৮। **সুবচনীর ব্রতকথা**—তারিণী ব্রাহ্মণী-বিরচিত। ভণিতা—"শুনিয়া আছাড় খায় কেশ নাহি বান্ধে। তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে দ্বিজমাতা কান্দে॥"

১৯। **সুবচনীর ব্রতকথা**—রচয়িতার নাম—দ্বিজ রামপ্রসাদ।

২০। **চণ্ডীর পাঁচালা**—দ্বিজ রঘুদেব-বিরচিত। ইহার পুথি এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী-বিরচিত গৌরীমঙ্গলের মধ্যে ইহার উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। যথা—"দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডীর পাঁচালি করিল।"

---

১ সুবচনী—শুভচণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং ইহাও চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত।

দ্বিতীয় অংশ—পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল

প্রবন্ধের প্রথম অংশে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গলের আলোচনা এ প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। তাই এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব না। পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল অর্থে প্রধানতঃ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বাঙ্গলা অনুবাদ,—কোন কোন পুস্তকে শক্তিতত্ত্ব এবং শাক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনাও আছে। এই শ্রেণীর যতগুলি প্রাচীন কাব্যের সন্ধান করিতে পারিয়াছি, এখানে তাহার একটি তালিয়া দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বলা বাহুল্য, লৌকিক চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায় পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গলও সুর-লয়-সংযোগে গান করা হইত।

১। **সারদামঙ্গল**—শিবচন্দ্র সেন-বিরচিত। মস্ত বই। কবির পরিচয় এই,—

বৈদ্যকুলে জন্ম হিঙ্গুসেনের সন্ততি। সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্বপুরুষ বসতি॥
রামচন্দ্র নাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত। যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত॥
রত্নেশ্বর গুণ ধারে তাহার তনয়। রতনস্বরূপ কুলে হইল উদয়॥
এহান তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত। রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥
সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল। রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধ কুল॥
গঙ্গাদেব দত্ত পুত্র তাহার পবিত্র। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুপবিত্র॥
বিক্রমপুরেতে কাঁটাদিয়া গ্রাম ধাম। ধন্বন্তরিবংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম॥
এহান তনয়া মহামায়া নাম তান। সরকারে সুপাত্রে করিলা কন্যাদান॥
গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান্। জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সন্তান॥
শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নাম। সম্প্রতি বসতিস্থান কাঁচাদিয়া গ্রাম॥

২। **দুর্গামঙ্গল**—দ্বিজ রামচন্দ্র-বিরচিত। এই কাব্যের মধ্যে ফরাসী এবং ফিরিঙ্গী নামের উল্লেখ আছে। যথা,—"কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস। দেখে কাঁপে কায় যায় জীবনের আশ॥"

৩। **গৌরীমঙ্গল**—পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী-প্রণীত। ইঁহার পিতার নাম বৈদ্যনাথ ত্রিবেদী। পুথির পত্রসংখ্যা—২৪৪। কাব্যখানি পুরাণের অনুকরণে রচিত। দেবী-মাহাত্ম্য, তীর্থমাহাত্ম্য, উপাসনা-পদ্ধতি এবং জীমূতবাহনের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। ৫টি খণ্ড এবং ৪১৯টি অধ্যায়ে বইখানি শেষ হইয়াছে। রচনার তারিখ—"সতের শ আটাইশ শকে, রচিলাম এ পুস্তকে, বারশত ত্রয়োদশ সন। গৌরীমঙ্গলের গীত, শ্রবণে ভক্তের প্রীত, ভবভয় উদ্ধার কারণ॥" ৪। **দুর্গাপঞ্চরাত্র**—জগৎরাম রায় ও তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ-বিরচিত। জগৎরাম মাত্র ইহার রচনা আরম্ভ করেন, পরে তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ ইহা শেষ করেন। কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়—রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য।

৫। **ভবানীমঙ্গল**—গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত। এই কাব্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পৃথ্বীচন্দ্রকৃত গৌরীমঙ্গলের মধ্যে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—"গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল।"

৬। **চণ্ডিকামঙ্গল**—হরিনারায়ণ দাস-বিরচিত। প্রতিপাদ্য বিষয়—মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য। বন্দনা অংশে কবি, জগন্নাথকে বৌদ্ধ দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—"কলি ভবে অবতরি, জগন্নাথ নাম ধরি, **বৌদ্ধরূপ** এ চান্দবদন। নীলাচলে করি বাস, কৈলে প্রভু পরকাশ, নিস্তারিতে কলিজীবগণ॥"

৭। **দুর্গামঙ্গল**—রূপনারায়ণ ঘোষ-বিরচিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। ইঁহার নিকট বাঙ্গলা ভাষা "অপভাষা" বলিয়া গণ্য ছিল,—"তাঁহার চরিত্র কিছু কহিতে করি আশা। শ্লেষ না করিয় ভাই বলি **অপভাষা**॥"

৮। **দুর্গাপুরাণ পাঁচালী**—মুক্তারাম নাগ-বিরচিত। প্রতিপাদ্য বিষয়—হরগৌরীর উপাখ্যান। ৯। **দুর্গামঙ্গল**—দ্বিজ কেবলরাম-বিরচিত। হিমালয়গৃহে দেবীর জন্ম হইতে বিবাহ ও কৈলাস গমন পর্য্যন্ত বিষয়ের বর্ণনা আছে।

১০। **দুর্গামঙ্গল**—ভবানীপ্রসাদ রায়-বিরচিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ এবং রামের দুর্গাপূজা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আছে। কাব্যখানি জন্মান্ধ কবির রচিত, ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

১১। **চণ্ডিকাবিজয়**—দ্বিজ কমললোচন-প্রণীত। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর অনুবাদ। ১৪৬ অধ্যায়ে কাব্যখানি সমাপ্ত। ১২। **চণ্ডিকামঙ্গল**—ভৈরবচন্দ্র রক্ষিত-বিরচিত। ইঁহার আর এক নাম রাধাচরণ রক্ষিত। কাব্যের বিষয়—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ।

১৩। **চণ্ডীমঙ্গল**—ব্রজলাল সেন-বিরচিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তারাম সেন "সারদামঙ্গল" রচনা করেন। প্রবন্ধের মধ্যে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৪। **দুর্গাপুরাণ**—মুক্তারাম নাগ-বিরচিত।* ১৫। **দুর্গাপুরাণ**—কবি জগন্নাথ-বিরচিত।* ১৬। **কালীপুরাণ**—মুক্তারাম নাগ-বিরচিত।*

১৭। **দুর্গাবিজয়**—রচয়িতার নাম—বনদুর্ল্লভ। যথা—"বনদুর্ল্লভে ভাবে দুর্গার চরণে। রক্ষা কর মহামায়া জগত ভুবনে॥" পুথিতে জয়দুর্গার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

১৮। **দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি**—রচয়িতা—শ্রীদীনদয়াল। ভণিতা,—"শ্রীদীনদয়ালে গায়, মতি রহুক তুয়া পায়, সদয় হইবে শূলপাণি॥" ইহার সম্পূর্ণ পুথি এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই—মাত্র নয়টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে জগদ্ধাত্রীর উপাখ্যানের বর্ণনা আছে।

১৯। **কালিকাবিলাস**—কালিদাস-বিরচিত। পুথির পত্রসংখ্যা—৫১। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। ২০। **গৌরীমঙ্গল**—রচয়িতা—দ্বিজ রামচন্দ্র। অসম্পূর্ণ পুথি। প্রতিপাদ্য বিষয়—নলদময়ন্তীর উপাখ্যান।

পরিশেষে বক্তব্য, এই প্রবন্ধ রচনার সময় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের রচিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে অনেক সাহায্য লওয়া হইয়াছে। লৌকিক ও পৌরাণিক চণ্ডী—তাঁহারই উদ্ভাবিত নাম। আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি। ইহা ছাড়া এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয়ে উক্ত গ্রন্থের নিকট আমি ঋণী।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

---

* ১৩০৮ সালের "আরতি" পত্রিকার ৮ম সংখ্যায় এই তিনখানি পুথি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে।